মা

ম্যাক্সিম গর্কী

অনুবাদক—বিমল সেন

বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড :: কলিকাতা

প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্মণ
বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

নবম সংস্করণ, জুন, ১৯৫০

কে, কে, ভট্টাচার্য কর্তৃক
কালিগঙ্গা প্রেস,
৪৬/১ বেচু চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
থেকে ১নং হইতে ১০নং ফর্মা পর্যন্ত
এবং
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫/৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
১১ ফর্মা থেকে বাকিটা
গৌরচন্দ্র পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

আড়াই টাকা]

ম্যাক্সিম গর্কীর মা'কে আজ বাঙালীর হাতে দেবার লগ্ন এসেছে। বহু আন্দোলন উত্তেজনার পর বাঙালী আজ বুঝ্তে পেরেছে, জাতির চরম দুর্ভাগ্য তার ধন-বৈষম্য। একদল খাটে আর উপোষ করে, আর একদল খায় এবং খাটায়। একদল ন্যায্য প্রাপ্য হ'তে বঞ্চিত—সে বঞ্চনা-কৌশলের নাম আইন; আর একদল চাহিদার বেশি গ্রাস ক'রে থাকে—সে বুভুক্ষার যুক্তি আভিজাত্য! শুধু রুশে নয়, সর্বদেশেই এবং বাঙলায়ও এই অবস্থা। চাই আজ মার্ক্সের নব-নীতি,—চাই আজ মজুর-বিপ্লব।

সেই বিপ্লবেরই অগ্রদূত গর্কীর 'মা'। 'মা' বিপ্লবীদের অগ্নিবেদ। বিপ্লব-আন্দোলনের সমস্ত মনস্তত্ত্ব এতে ফুটে উঠেছে নিখুঁতভাবে এবং অগ্নি-বর্ষী ভাষায়। সমস্ত দেশের সমস্ত বিপ্লবী যেন মা'র মধ্যে এসে ঘনীভূত হ'য়েছে। বছরের পর বছর 'মা' সকল দেশের—বিশেষ করে, বাঙলার বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত ক'রে এসেছে। 'মা' পড়লেই এই কথাটা সবার আগে মনে হবে।

কিন্তু এই নব-নীতির পথ কোনো দেশেই সহজ হয় নি। বহু দ্বিধা, বহু সংস্কার, বহু নির্যাতন, বহু নিরাশায় দুল্তে দুল্তে একে এগোতে হয়েছে। সাম্নে দাঁড়িয়েছে এর পর্বতোপম দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; এ হয়তো থম্কে দাঁড়িয়েছে কিন্তু পিছোয়নি, বাধা বিদীর্ণ ক'রে দেশের অন্তরে প্রবেশ ক'রেছে। গর্কী 'মা'র চরিত্রে এই রুশ-জননীর অগ্রগতিকে

রূপ দিয়েছেন। যে মা প্রথমে দুঃখকে একমাত্র ভাগ্যলিপি মনে ক'রেছিলেন—বিপ্লবের নামে আঁৎকে উঠেছেন, দিনে দশবার ক'রে মানুষের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য কেঁদে পড়েছেন ভগবানের কাছে, তিনিই ধীরে ধীরে দীক্ষিত হলেন পূর্ণ বিপ্লবমন্ত্রে—ভগবানের বিরুদ্ধে ক'র্লেন বিদ্রোহ। বাধা হ'ল তাঁর দূর। প্রচ্ছদপটে শিল্পী মা'র এই ভাবটাই পরিস্ফুট করেছেন—নব-নীতি আপাত-অলঙ্ঘ্য পর্বত-সমান বাধার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে এই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যে বাধা অপসারিত ক'রে পথ ক'রে নেবেই।

আজ মা'কে পাঠক-সমাজের হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এটা স্থির জান্‌চি যে, আমাদের দেশেও আজ এ নব-নীতি অবজ্ঞাত, উপহসিত, বাধাপ্রাপ্ত হ'লেও অদূর ভবিষ্যতে এর পথ খোলসা হবে,—না হয়ে থাক্‌বেনা। আমরা সেই ভবিষ্যতের দিন গুন্‌ছি।

বিমল সেন

মা

—এক—

রোজ ভোরে কারখানার বাঁশি বেজে ওঠে···তীক্ষ্ণ তীব্র ধ্বনিতে মজুর-পল্লির ধূম্র-পঙ্কিল আর্দ্র বাতাস কম্পিত হয়, আর ছোট ছোট কুঠ্‌রি থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বেরিয়ে আসে দলে দলে মজুর। অপ্রচুর নিদ্রায় আড়ষ্ট দেহ, কালো মুখ। উষার কন্‌কনে হাওয়া···সংকীর্ণ মেটো পথ···তারই মধ্য দিয়ে চ'লে তারা গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই উঁচু পাথরের খাঁচাটার মধ্যে, যেটা তাদের গ্রাস করবার জন্য কাদা-ভরা পথের দিকে চেয়ে আছে শত শত হল্‌দে তৈলাক্ত চক্ষু বিস্তার ক'রে। পায়ের তলায় কাদা চট্‌ চট্‌ করতে থাকে···কাদাও যেন তাদের ভাগ্য নিয়ে বিদ্রূপ করছে; কানে আসে নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠের কর্কশ ধ্বনি, ক্রুদ্ধ তিক্ত গালাগালির শব্দ···তারপর সে-সব ডুবে যায় কলের গম্ভীর ধ্বনিতে, বাষ্পের অসন্তোষ-ভরা গর্জনে। কালো কঠিন চিম্‌নি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় পল্লির বহু ঊর্ধ্বে। সন্ধ্যায় কারখানা তাদের ছেড়ে দেয় দগ্ধ-সর্বস্ব ছাইয়ের মতো। আবার তারা পথ বেয়ে চলে···ধোঁয়া-মলিন মুখ··· মেশিন-তেলের বোট্‌কা গন্ধ···ক্ষুধার্ত সাদা দাঁত···কিন্তু সজীব, আনন্দপূর্ণ কণ্ঠ। সেদিনকার মতো কঠিন শ্রম-দাসত্ব হ'তে তারা মুক্তি পেয়েছে, এখন শুধু বাড়ি ফেরা, খাওয়া এবং ঘুম।

গোটা দিনটা হজম করে ওই কারখানা। কল মানুষকে ইচ্ছামতো শোষণ করে···জীবন থেকে একটা দিন সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়···

মানুষ অজ্ঞাতসারে এগোয় তার কবরের দিকে। তবু তারা খুশি··· তাড়ি আছে, আমোদ আছে।···আর কি চাই!

ছুটির দিনে মজুরেরা ঘুমোয় দশটা তক···তারপর উঠে' সব চেয়ে পছন্দসই পোশাকটি প'রে গির্জায় যায়···যাবার আগে ধর্ম-বিমুখতার জন্য ছোটদের একচোট ব'কে নেয়। ফিরে এসে পিরগ খায়; তারপর সন্ধ্যাতক ঘুমোয়। সন্ধ্যায় পথের ওপর আনন্দের মেলা বসে। পথ শুকনো হ'ক, তবু ওভার-স্যু যাদের আছে পরে বেরোয়···বর্ষা না থাকলেও ছাতা নিয়ে পথে নামে! যার যা' আছে তাই নিয়ে সে স্যাঙ্গাতদের ছাড়িয়ে উঠতে চায়। পরস্পর দেখা হ'লে কল-কারখানার কথাই বলে··· ফোরম্যানকে গালি দেয়, কল-সংক্রান্ত কথা নিয়েই মাথা ঘামায়। ঘরে ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে. মাঝে মাঝে তাদের নির্মমভাবে মারে। যুবকেরা মদ খায়, এর-ওর বাড়ি আড্ডা দিয়ে ফিরে, অশ্লীল গান গায়, নাচে, কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে' আসে··· নোংরা গা, ছেঁড়া পোশাক, ছিন্ন মুখ···কাকে মেরেছে তারই বড়াই, কার কাছে পিটুনী খেয়েছে তারই অপমানের কান্না। কখনো কখনো বাপ-মা-ই তাদের তুলে আনেন পথ কিংবা তাড়িখানা থেকে, মাতাল অবস্থায়। কটুকণ্ঠে গালমন্দ করেন···স্পঞ্জের মতো মদসিক্ত শরীরে দু'দশ ঘা বসান···তারপর রীতিমতো শুইয়ে দেন···পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে কাজে পাঠান।

বহু বছর ব্যাপী অবসাদের ফলে ক্ষুধা-শক্তি তাদের লোপ পেয়েছে··· ক্ষুধা উদ্রেক করার জন্য তারা গ্লাসের পর গ্লাস মদ চালায়। ক্রমে মদের মাত্রা চড়ে যায়···প্রত্যেকের প্রাণেই মাথা তু'লে দাঁড়ায় একটা অবোধ্য পীড়াদায়ক অসন্তুষ্টি, যা' ভাষায় ফুটতে চায়। এই অশান্তিকর উদ্বেগের

বোঝা হালকা করার জন্যই তারা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়টি নিয়েও হানাহানি করে হিংস্র পশুর মতো…কখনো আহতাঙ্গ হয়, কখনো মরে। এই প্রচ্ছন্ন হিংস্রতা ধীরে ধীরে বেড়ে চলে জীবনে। তারা জন্মে আত্মার এই পীড়া নিয়ে। এ তাদের পিতৃধন। কালো ছায়ার মতো কবর পর্যন্ত লেগে থাকবে সঙ্গে…জীবনকে করবে উদ্দেশ্যহীন, নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিক উত্তেজনায় কলঙ্কিত!

চিরকাল…বছরের পর বছর…জীবন-নদী ব'য়ে এসেছে এম্‌নি ধারায়। মন্থর, একঘেয়ে তার গতি…পঙ্কিল তার স্রোত। দিনের পর দিন তারা একই কাজ করে চলে রুটিনের মতো…জীবনের এ ধারা বদলাবার ইচ্ছে বা অবসর যেন কারো নেই।

নতুন কেউ যখন পল্লিতে আসে, নতুন বলেই দু'চারদিন সে তাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। তার কাছে ভিন্‌-মুলুকের গল্প শোনে, সবাই বোঝে, সর্বত্রই মজুরের ঐ এক অবস্থা। নবাগতের ওপর আর কোন আকর্ষণ থাকে না।

মাঝে মাঝে কোন নয়া লোক এসে এমন-সব অদ্ভুত কথা বলে যা' মজুর-পল্লিতে কেউ কখনো শোনেনি। তারা তার কথা কান পেতে শোনে…বিশ্বাসও করে না, তর্কও করে না। কারো মধ্যে জেগে ওঠে অন্ধ বিক্ষোভ, কেউ হয় ভীত বিব্রত, কেউ হয়ে ওঠে এক অজানা লাভের ক্ষীণ সম্ভাবনায় চঞ্চল। তারা পানের মাত্রা চড়িয়ে দেয়, যাতে এই অনাবশ্যক বিরক্তিকর উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলতে পারে। নবাগতকে যেন তারা ভয়ের চোখে দেখে…সে হয়তো তাদের মধ্যে এমন-কিছু এনে ফেলবে যা' তাদের সহজ জীবন-স্রোতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি ক'রবে। তারা আশাই করেনা যে তাদের অবস্থারও আবার উন্নতি হ'তে পারে।

প্রত্যেক সংস্কারকে তারা সংশয়ের চোখে দেখে···ভাবে, শেষপর্যন্ত এ শুধু তাদের বোঝা বাড়াবে মাত্র। তাই তারা নবাগতদের এড়িয়ে চলে।

এমনি করে মজুরদের পঞ্চাশ বছরের জীবন কেটে যায়।

কামার মাইকেল ভ্লাশভের জীবনও কেটে যায় এমনি ধারায়। গম্ভীর কালো মুখ, সন্দেহ-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ছোট ছোট চোখ, অবিশ্বাস-ভরা হাসি, উদ্ধত ব্যবহার, কারখানার ফোরম্যান এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও কেয়ার করে না, কাজেই কামায় কম। ফি ছুটির দিনে কাউকে মারা চাই; কাজেই পাড়ার সবাই তাকে ভয় করে, অপছন্দ করে। মারতে গিয়েও ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে। শত্রুর সাড়া পেলেই ভ্লাশভ হাতের কাছে গাছ, পাথর, লোহা যা' পায় তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। সব চেয়ে ভয়ানক তার চোখদুটো···তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে যেন লোহার শলাকার মতো শত্রুকে বিদ্ধ করে···সে চোখের সাম্‌নাসাম্‌নি যে পড়ে সেই বোঝে কী এক হিংস্র ভয়-ডরহীন নিষ্ঠুর জল্লাদের কবলে সে পড়েছে। মুখের-ওপরে-এসে-পড়া ঘন চুলের ফাঁকে ফাঁকে তার হলদে দাঁত ভয়ংকরভাবে কট্‌মট্‌ করতে থাকে। 'দুরহ নারকী কীট'—ব'লে সে তর্জন ক'রে ওঠে···শত্রুদল চকিতে রণে ভঙ্গ দিয়ে গালি দিতে দিতে পালায়। মাথা খাড়া করে দাঁতের মধ্যে ছোট মোটা একটা চুরুট চেপে সে তাদের পিছু নেয়, আর চ্যালেঞ্জ করে, কোন্‌ ব্যাটা মরতে চাস্‌, আয়। কেউ চায়না।

এমনি সে খুব কম কথা বলে, শুধু 'নারকী কীট' এই কথাটা তার মুখে লেগেই আছে। কারখানার কর্তাদের থেকে শুরু করে পুলিসদের পর্যন্ত সে ঐ ব'লে ডাকে। বাড়িতে গিয়ে বউকে পর্যন্ত বলে, 'নারকী কীট' আমার পোশাক যে ছিঁড়ে গেলো, দেখতে পাস না?

তাঁর ছেলে পেভেলের বয়স যখন চৌদ্দ, তখন একদিন তার চুল ধ'রে টানতে গেলো। পেভেল পলকে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে বললো, ছুঁয়োনা বলছি।

কী!—পিতা কৈফিয়ৎ তলবের সুরে গর্জে উঠলো।

পেভেল অবিচলিত কণ্ঠে বললো, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছি না। ব'লে হাতুড়িটা সে একবার সদর্পে মাথার ওপর ঘোরালো।

পিতা তার দিকে চাইলেন, তারপর লোমবহুল হাত দু'খানা ছেলের পিঠে রেখে হেসে বললেন, বহুৎ আচ্ছা! ধীরে ধীরে তাঁর বুক ভেঙে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো, ব'লে উঠলেন, 'নারকী কীট'···

···এর কিছুকাল পরে বউকে একদিন ডেকে বললেন, আমার কাছে আর টাকা চেয়োনা, ছেলেই এবার থেকে তোমায় খাওয়াবে।

স্ত্রী সাহস ক'রে প্রশ্ন করলো, আর তুমি বুঝি মদ খেয়ে সব ওড়াবে?

সে কথায় তোর কাজ কি, 'নারকী কীট' কোথাকার!

সেই থেকে মরণ অবধি তিন বছর ছেলেকে সে চোখ চেয়ে দেখেনি, ছেলের সঙ্গে কথা বলেনি।

মরলো সে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে। পাঁচদিন ধ'রে বিছানায় গড়াচ্ছে··· সমস্ত অঙ্গ কালো হ'য়ে গেছে···দাঁত কট্‌মট্‌ করছে···চোখ বোজা! মাঝে মাঝে ব্যথা যখন বড়ই অসহ্য হয়, বউকে ডেকে বলে, আর্সেনিক দাও, বিষ দাও।

বউ ডাক্তার ডাকলো। ডাক্তার পুলটিশের ব্যবস্থা করলেন, বললেন, অচিরে একে হাসপাতালে নিয়ে অস্ত্র করা দরকার।

মাইকেল গর্জে উঠলো, গোল্লায় যাও। আমি নিজে নিজেই মরতে পারব 'নারকী কীট' কোথাকার।

ডাক্তার চ'লে গেলে বউ সজল চোখে জেদ করতে লাগলো, অস্ত্র করাও।

সে হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বউকে ভয় দেখিয়ে বল্‌লো, কোন্ সাহসে ওকথা বলিস্; জানিস, আমি ভালো হ'য়ে উঠলে তোর বিপদ।

ভোরে কারখানার বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা গেলো। বউ একটু কাঁদলো, ছেলে মোটেই না। পাড়া-পড়শীরা বললো, বউটার হাড় জুড়িয়েছে, মাইকেল মরেছে। একজন ব'লে উঠলো, মরেনি, পশুর মতো পচতে পচতে জীবনপাত করেছে।

গোর দিয়ে যে যার ঘরে চ'লে গেলো···দীর্ঘকাল ব'সে রইলো শুধু মাইকেলের কুকুরটা···কবরের তাজা মাটির ওপর ব'সে নীরবে সে কার স্নেহ-কোমল পরশের অপেক্ষা করে।

—দুই—

দু'হপ্তা পরে এক রবিবারে পেভেল বাড়ি ফিরলো মাতাল হয়ে··· টল্‌তে টল্‌তে পড়লো গিয়ে ঘরের এক কোনায়—পিতার মতো টেবিলের ওপর ঘুষি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মা, খাবার।

মা উঠে গিয়ে তার পাশটিতে বস্‌লেন, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে

ছেলের মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। ছেলে মাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো, জল্‌দি খাবার!

'বোকা ছেলে!' দুঃখ-ভরা স্নেহ-সজল কণ্ঠে মা তাকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোনো মতে জিভটাকে টেনে জড়িতস্বরে পেভেল বললো, আমি তামাক খাবো, বাবার পাইপটা এনে দাও।

এই প্রথম সে মাতাল হয়েছে। মদে তার শরীর নিস্তেজ হয়েছে কিন্তু জ্ঞান লোপ পায়নি। বারে বারে একটা প্রশ্ন তার মগজে এসে ঘা খেতে লাগলো, 'মাতাল? মাতাল?'···মা যত আদর করেন, তত তার অস্থিরতা বাড়ে···মায়ের করুণ দৃষ্টি তাকে ব্যথা দেয়···সে কাঁদতে চায় কিন্তু পারে না।···মাতলামি দিয়ে উদ্যত ক্রন্দনকে রোধ করতে যায়। মা তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ধীরে ধীরে বলেন, কেন এ কাজ করিস্ বাবা? এ তো তোর কর্তব্য নয়!

সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, বমি করে···মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দেন··· ভিজে তোয়ালে দিয়ে উষ্ণ কপাল ঢেকে দেন। সে একটু সুস্থ হয়··· কিন্তু তার চারপাশে সব-কিছু যেন দুলছে···তার চোখের পাতা ভারি··· মুখে নোংরা টক আস্বাদ। চোখের পাতার মধ্য দিয়ে মায়ের বড় মুখ-খানির দিকে চায় আর এলোমেলো চিন্তা করে, হয়তো আমার এখনো মদ খাবার বয়স হয়নি। অন্য সবাই খায়, তাদের তো কিছু হয় না··· আমি শুধু ভুগি।

দূরে কোনো স্থান থেকে মায়ের কোমল কণ্ঠ ভেসে আসে, তুই মাতাল হ'লে তোর এ বুড়ো মাকে কি করে খেতে দিবি, বাবা?

চোখ বুজে সে বলে, সবাই তো খায়।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। ছেলে মিথ্যে বলেনি। তিনি নিজেই জানেন, শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোনো স্থান জোটেনা মজুরদের আনন্দ করার…মদ ছাড়া আর কোনো বিলাসিতা তাদের কপালে নেই…তবু বলেন, খাস্‌নি, খাস্‌নি, বাবা! তোর বাবা মদ খেয়ে আমাকে জীবন-ভোর দুঃখ-দুর্দশায় ডুবিয়ে রেখে গেছেন…তুই তোর মায়ের ওপর দয়া কর্। করবিনি, বাবা?

পেভেল মায়ের কোমল-কাতর কথাগুলি কান পেতে শোনে। পিতার জীবদ্দশায় মা ছিলেন নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা, ভীতা…সে কথা মনে পড়ে। পিতার ভয়ে বাইরে বাইরেই ঘুরতো ব'লে মা যেন তার কাছে প্রায় অপরিচিতই র'য়ে গেছেন। আজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইলো। লম্বা, ঈষৎ নম্র দেহ দীর্ঘবর্ষব্যাপী শ্রমে এবং স্বামীর নির্যাতনে তা' যেন ভেঙে পড়েছে…চলেন নিঃশব্দে, একদিকে ঈষৎ হেলে…সর্বদা যেন কোন কিছু থেকে আঘাত পাবার ভয়। প্রশস্ত গোলগাল মুখ…কপালে চিন্তার রেখা…বার্ধক্যে চর্ম লোল…এক জোড় কালো চোখ উদ্বেগ এবং বিষাদে ভরা…ডান ভুরুতে একটা গভীর কাটা দাগ, ফলে ভুরুটা যেন একটু উঁচুতে ঠেলে উঠেছে…ডান কানটাও একটু লম্বা বাম কানটার চাইতে… দেখলে মনে হয়, কান যেন কি শুনবে এই আতঙ্কে উন্মুখ! গভীর কালো চুলের মাঝে মাঝে সাদা সাদা গুচ্ছ, যেন সেগুলি আঘাতের চিহ্ন। কোমল, করুণ…বাধ্য…এই মা। দু'চোখ দিয়ে তার জল গড়ায় ধীরে ধীরে।

ছেলে কোমল অনুনয়-ভরা কণ্ঠে বললো, চুপ কর, মা, কেঁদোনা, আমায় জল দাও।

মা উঠলেন, বললেন, বরফজল এনে দিচ্ছি।

কিন্তু মা যখন ফিরলেন তখন সে নিদ্রিত।

পান-পাত্র টেবিলের ওপর রেখে মা নীরবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বাইরে মজুরদের মাতলামি-ভরা সঙ্গীত, গালাগালি এবং চীৎকার।

আবার দিন ব'য়ে চললো তেমনি একটানা সুরের মতো…শুধু এ বাড়ি থেকে আগের সে মাতলামি, সে অশান্তি লোপ পেতে লাগলো। পল্লির অন্যান্য বাড়ি থেকে একটু স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাড়িখানি পল্লির এক-প্রান্তে, একটু ঢালু জায়গায়। তিনটি কামরা, …একটি রান্নাঘর…একটি ছোট কুঠরি…মায়ের শোবার ঘর, রান্নাঘর থেকে একটি ছাদ পর্যন্ত উঁচু পার্টিশনে ভিন্ন করা…ঘরের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে এই দু'টো কামরা। বাকিটা একটা চৌকো কামরা, তাতে দু'খানা জানালা, কোনায় পেভেলের বিছানা, তার সামনে একটা টেবিল, দু'খানা বেঞ্চি, কয়েকখানা চেয়ার, একটা ছোট আরশিওয়ালা হাত-ধোয়ার পাত্র, একটা ট্রাঙ্ক, একটা ঘড়ি এবং দু'টো আইকন।

অন্যান্য সবাই যেমন দিন কাটায়, পেভেলও চেষ্টা করেছিলো তেমনি ভাবে দিন কাটাতে। একজন যুবক যা' করে থাকে, সব-কিছু সে করলো …একটা বেহালা কিনলো, সার্ট, রঙীন নেকটাই, জুতো, ছড়ি—কোন কিছুই আর তার বাদ রইলো না। বাহ্যত সে সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদেরই মতো…সান্ধ্যভোজে যায়…নাচে…মদ খায়, তারপর মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, বুক জ্বলে, মুখ-চোখ মলিন হয়…আবার মা প্রশ্ন করেন, কালকের দিন ভালো কাটলো, বাবা?

ক্ষুব্ধ বিরক্ত হ'য়ে সে ব'লে ওঠে, ও গোরস্থানের মতো নীরস…সবাই যেন এক-একটা মেশিন…তার চেয়ে মাছ ধরতে কি শিকার করতে যাবো।

কিন্তু তার মাছ ধরাও হ'য়ে উঠলোনা, শিকার করাও হ'য়ে উঠলো না।

ধীরে ধীরে সে সকলের চলা-পথ ত্যাগ ক'রে অন্য এক পথে এসে দাঁড়ালো। মজলিসে যাওয়া তার ক্রমশ কমে এলো। ছুটির দিন যদিও সে কোথাও বেরিয়ে যায়, কিন্তু আর কখনো মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফেরে না। মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, ছেলের চোখ-মুখ যেন কি একটা অনুপ্রেরণায় ক্রমশ গম্ভীর, কঠিন, তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে···যেন সব-সময়ই তার মন জ্বলছে কোনো-কিছুর ওপর ক্রোধে···অথবা যেন একটা গোপন ক্ষত অহর্নিশ তাকে খোঁচাচ্ছে। বন্ধুরা আসতো প্রথম প্রথম···কিন্তু কোনোদিন তাকে বাড়ি না পেয়ে আসা ছেড়ে দিলো। মা ছেলের এই স্বাতন্ত্র্য দেখে খুশিও হলেন, শঙ্কিতও হলেন। ছেলে এদিকেও টল্‌ছে না, ওদিকেও টল্‌ছে না···রুটিন-বাঁধা জীবনও তার নয়···সে চলেছে দৃঢ় নিষ্ঠায়, অটুট সংকল্পে কোন এক গোপন পথে···তাই মায়ের শঙ্কা।

বাড়িতে সে বই নিয়ে আস্‌তে লাগলো। প্রথম প্রথম সে লুকিয়ে পড়তো, পড়ে' লুকিয়ে রাখতো···মাঝে মাঝে বই থেকে অংশবিশেষ কাগজে নকল ক'রে কাগজখানাও লুকিয়ে ফেলতো। মা-ছেলেতে কথাবার্তা বড় একটা হ'ত না। দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যায় হাত-মুখ-ধু'য়ে খাওয়া শেষ ক'রে ছেলে বই নিয়ে বসতো, অনেক রাত পর্যন্ত পড়া চলতো। ছুটির দিনে ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতো, ফিরতো অনেক রাতে। তার ভাষা মার্জিত হ'তে লাগলো, মা তার মুখে নতুন অজানা শব্দ শুনে অবাক হ'য়ে যেতেন। মায়ের শঙ্কা বাড়তো। ছেলে বই আনে, ছবি আনে, ঘর সাজায়, ফিট্‌ফাট হ'য়ে থাকে। মাতলামি নেই, গালাগালি নেই। ছেলে কি সন্ন্যাসী হল?···খুব সম্ভব শহরের কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তাই বা কি ক'রে হ'বে? তাতে

তো টাকা দরকার···ছেলে প্রায় সব টাকাই তো এনে মায়ের হাতে দেয়।······

এমনি ক'রে দু' বছর কাট্‌লো।

একদিন সান্ধ্যভোজের পর পেভেল ঘরের এক কোনে ব'সে পড়ছে··· মাথার ওপর কেরোসিনের ল্যাম্প ঝুল্‌ছে···রান্নাঘরের বাসন-পত্র মুক্ত ক'রে মা সন্তর্পণে ছেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছেলে মাথা তু'লে নিঃশব্দে প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইলো।

কিছু না পাশা! এমনি এলুম,—তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন মা এই কথা ব'লে, কিন্তু চোখে তাঁর উদ্বেগের সুস্পষ্ট ছাপ। এক মুহূর্ত রান্নাঘরে স্থির, চিন্তামগ্ন, অভিনিবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হাতমুখ ধুয়ে ফেলে আবার ছেলের কাছে এলেন, বললেন মৃদু-কোমল সুরে, একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই, বাবা, দিনরাত সব সময় কেবল পড়িস কেন?

বইখানা একপাশে সরিয়ে রেখে পেভেল বললো, মা, বোসো। মা ছেলের পাশে বসলেন···তাঁর দেহ ঋজু হ'য়ে উঠ্‌লো, ভীষণ একটা-কিছু শোনার বেদনাময় উৎকণ্ঠায়। তাঁর দিকে না চেয়েই পেভেল ধীরে কিন্তু দৃঢ়তা-মাখানো সুরে বলতে লাগলো, আমি নিষিদ্ধ বই পড়ছি। এ বই নিষিদ্ধ—কারণ এতে মজুর-জীবনের খাঁটি ছবি আঁকা। এ বই ছাপা হয় গোপনে···আর আমার কাছে এ বই আছে, এ যদি প্রকাশ পায়, তাহ'লে আমার জেল হবে—আমার জেল হবে আমি সত্যি জানতে চাই এই অপরাধে।

মার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো···বড় বড় চোখ মেলে ছেলের

দিকে তিনি চাইলেন···মনে হ'ল, এ যেন সে ছেলে নয়, এ নতুন··· অপরিচিত। ছেলের জন্য দরদে তাঁর বুক ভরে উঠলো, কেন এমন কাজ করিস, বাবা?

মার দিকে চেয়ে শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে পেভেল বললো, আমি সত্য জানতে চাই, মা।

ছেলের শান্ত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বরে রহস্য-সংকুল ভীষণ কি একটা সংকল্পের সাড়া পেয়ে মা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর চোখে নীরব অশ্রু দেখা দিলো।

কেঁদোনা মা।—পেভেলের মৃদু দরদ-ভরা কণ্ঠ মার কানে এসে ঠেকলো বিদায়-বাণীর মতো। পেভেল বলতে লাগলো, মা, ভেবে দেখ দেখি, এ কি জীবন কাটাচ্ছ তুমি! তোমার বয়স চল্লিশ বছর···কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচা কি একটা দিনও বেঁচেছ তুমি? বাবা তোমাকে মারতেন। আমি আজ বুঝি, তাঁর জীবন-ভরা দুঃখের ঝাল ঝাড়তেন তোমার গায়ে···দুঃখ তাঁকে পিষ্ট ক'রে ফেলতো, কিন্তু সে দুঃখের মূল কি, তা তিনি জানতেন না। তিরিশ বছর খেটে গেছেন। কারখানায় যখন সবেমাত্র দু'টি দালান, তখন থেকে তিনি খাটতে শুরু করেন··· এখন সেখানে সাত-সাতটা দালান। কল সমৃদ্ধ হয়, কিন্তু মানুষ মরে··· কলের জন্য খাটতে খাটতে মরে।···

আতঙ্ক এবং আগ্রহে উন্মুখ হ'য়ে মা শুনতে লাগলেন। ছেলের চোখ জ্বলছে এক অপরূপ সুন্দর দীপ্তিতে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে, মার আরো কাছে মুখ নিয়ে তাঁর সজল চোখের দিকে চেয়ে বললো, আনন্দ তুমি কি পেয়েছো জীবনে? তোমার অতীত জীবন···মনে রাখার মতো কতটুকু ছিল তাতে?

মা করুণভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন···দুঃখ এবং আনন্দ-মেশানো এক অজ্ঞাত নতুন ভাব তাঁর ব্যথিত উদ্বিগ্ন অন্তরের ওপর ছড়িয়ে পড়লো শান্তি-প্রলেপের মতো। নিজের সম্বন্ধে, নিজ জীবন সম্পর্কে এমন কথা এই প্রথম কানে এলো তাঁর। যৌবনে তাঁর মনেও একদিন আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি, বিদ্রোহ ধূমায়িত হ'য়ে উঠেছিল···কিন্তু তা' বহুদিন হল নিঃশেষে চাপা পড়ে গেছে। আজ যেন সেই আগুন নতুন ক'রে উস্‌কে উঠ্‌ছে। চিরদিন তারা শুধু দুঃখের অভিযোগই ক'রে এসেছে···কিন্তু এ দুঃখের কারণ কি, প্রতিকারই বা কি···তা' নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। আজ সে সমস্যার সমাধান করবার মহৎ সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর ছেলে··· গৌরবে, আনন্দে তাঁর বুক ভ'রে উঠলো···ছেলের বক্তৃতার মাঝখানে ব'লে উঠলেন, তা, কি করতে চাও তুমি?

পাঠ করতে হবে এবং প'ড়ে অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের মজুরদের পাঠ করা অত্যন্ত দরকার···আমাদের শিক্ষা করতে হবে, বুঝতে হবে, জীবন কেন আমাদের পক্ষে এত দুর্বহ।

মার বলতে ইচ্ছা হ'ল, বাছা, তুমি কি করবে? ওরা যে তোমায় পিযে ফেলবে! তোমার প্রাণ যাবে! কিন্তু ছেলের আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে সাহস হ'ল না। ছেলে অগ্নিগর্ভ ভাষায় মনের জ্বালা ব্যক্ত ক'রে যায়, মা সচকিত হ'য়ে নিম্নস্বরে সুধোন, তাই নাকি, পাশা?

হাঁ, মা—ছেলে দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়। তারপর মাকে সে বলে সেই সব লোকের কথা, যাঁরা চান শুধু মানুষের মঙ্গল, যাঁরা চান শুধু মানুষের অন্তরে সত্যের বীজ বপন করতে···এবং এই অপরাধে তাঁরা পশুর মতো হত হন···জেলে যান, নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করেন, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

হন···মানুষের দুশমন যারা তাদের হাতে। আবেগের সঙ্গে বলে, এমন সব লোক আমি দেখেছি, মা···এঁরা দুনিয়ার সেরা লোক।

মা আবার বলতে যান, তাই নাকি, পাশা? কিন্তু বলা হয় না। তাঁর ছেলেকে এমন সব বিপজ্জনক কথা বলতে শিখিয়েছে যাঁরা, তাঁদের গল্প শুনে শঙ্কিত হতে থাকেন। ছেলে মার হাত ধ'রে প্রগাঢ় স্বরে ডাকে, 'মা!' মা বিচলিত হন। বলেন, আমি কিছু করবনা বাছা,···শুধু তুই সাবধানে থাকিস···সাবধানে থাকিস্।

কিন্তু কি হ'তে সাবধানে থাকবে, তা খুঁজে না পেয়ে ব'লে ফেলেন, তুই বড় রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস। তারপর তাঁর স্নেহ-ভরা দৃষ্টি দিয়ে পুত্রের সুগঠিত দেহখানি যেন আলিঙ্গন ক'রে বলেন, তুই যেমন খুশি চল্, আমি বাধা দেবো না, বাবা। শুধু একটা কথা মনে রাখিস আমার, অসতর্ক হ'য়ে কথা বলিস না···লোকদের নজরে নজরে রাখিস···ওরা সবাই পরস্পরকে ঘৃণা করে···অন্যের অনিষ্ট ক'রে খুশি হয়···নিছক আমোদের লোভে মানুষকে পীড়া দেয়···যেই তাদের দোষ দিতে যাবি, বিচার করবি, অম্‌নি তারা তোকে ঘৃণা করবে,···তোর সর্বনাশ করবে।···

দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পেভেল মায়ের এই বেদনাময় অভিজ্ঞতার উপদেশ শুনলো; তারপর মার কথা শেষ হ'লে বললো, জানি, মা, কী শোচনীয় এই মানুষের দল! কিন্তু যেদিন উপলব্ধি করলুম, পৃথিবীতে একটা সত্য আছে, মানুষ আমার চোখে নতুনতর, সুন্দরতর শ্রীতে দেখা দিলো। শৈশবে আমি মানুষকে শিখেছিলুম ভয় করতে, একটু বড় হ'য়ে করেছি ঘৃণা···আজ নতুন চোখে দেখছি সবাইকে···সবার জন্যই আজ আমি দুঃখিত। কেন জানিনা, আমার হৃদয় কোমল হ'য়ে এলো যখন

আমি বুঝলুম, মানুষের ভিতর একটা সত্য আছে, পাপ এবং পঙ্কিলতার জন্য সকল মানুষই দায়ী নয়।...

বলতে বলতে পেভেলের কণ্ঠ নীরব হয়...কান পেতে যেন শোনে প্রাণের ভিতরের কি এক অস্ফুট বাণী, তারপর চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলে ওঠে...এমনি ক'রেই সত্য বেঁচে থাকে।

পেভেল ঘুমোয়, মা তাকে আশীর্বাদ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে যান।

—তিন—

মাঝ হপ্তায় এক ছুটির দিনে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পেভেল মাকে বলে, মা, শনিবার জনকয়েক লোক আসার কথা আছে এখানে।

কারা ?

দু'চারজন এ পল্লিরই লোক...বাকি আসবে শহর থেকে।

শহর থেকে ? মাথা নেড়ে মা বললেন, পরক্ষণেই তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পেভেল ব্যথিত হ'য়ে বললো, এ কি মা, কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে ?

জামার হাতায় চোখ মুছে মা বললেন, জানি না, কান্না পাচ্ছে।

ঘরের এদিক-ওদিক পায়চারি ক'রে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে পেভেল প্রশ্ন করলো, ভয় পাচ্ছ, মা ?

মা ঘাড় নাড়লেন, হাঁ—শহরের লোক, কে জানে কেমন !...

পেভেল নীচু হ'য়ে মার দিকে চাইলো, তারপর ঈষৎ আহত এবং ক্রুদ্ধভাবে বললো, এই ভয়ই আমাদের সর্বনাশের মূল...যারা কতা

তারা এই ভয়কে ষোলো-আনা কাজে লাগায়···আমাদের উত্তরোত্তর ভীত ক'রে তোলে। শোন, মা···মানুষ যতদিন ভয়ে কাঁপবে, ততদিন তাকে পচে পচে মরতে হবে···আমাদের সাহসী হ'তে হবে, আজ সেদিন এসেছে।

তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, ভয় খাও, আর যা' কর, তারা আসবেই।

মা করুণভাবে বললেন, রাগ করিস্‌নি বাবা, কি ক'রে ভয় না পেয়ে থাকি বল···চিরটা জনম আমার ভয়ে ভয়েই কেটেছে।

ছেলে আরও নরম হ'য়ে বলে, ক্ষমা কর, মা, কিন্তু আমি বন্দোবস্ত বদলাতে পারব না।

তিনদিন ধ'রে মার প্রাণে কাঁপুনি···ভাবেন, যারা আসছে বাড়িতে, না জানি তারা কী ভয়ংকর লোক···তাঁর গা শিউরে ওঠে।

শেষে শনিবার এলো। রাত্রে পেভেল মাকে বললো, মা, আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি, ওরা এলে বসিয়ো, বলো, এক্ষুণি আসছি। আর ভয় খেয়ো না···তারাও অন্য সবারই মতো মানুষ।

মা প্রায় মূর্ছিত হয়ে চেয়ারে বসে পড়েন।

বাইরে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। কে যেন তার মধ্য দিয়ে শিষ দিতে দিতে এগোচ্ছে···শব্দ নিকট থেকে নিকটতর হ'য়ে জানালার কাছে এসে পড়লো···পায়ের শব্দ শোনা গেলো···মা ভীত চকিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন···দোর খুলে গেলো···প্রথমে দেখা গেলো, একটি প্রকাণ্ড হ্যাট, তলায় অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ···তারপরে ঢুকলো একটি ক্ষীণ আনতদেহ···

দেহকে ঋজু করে ডান হাত তু'লে আগন্তুক অভিবাদন করলো, নমস্কার।

মা নীরবে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন, পেভেল ফেরেনি এখনো।

নবাগত নিরুত্তরে নিরুদ্বিগ্নভাবে লোমের কোটটা ছেড়ে রেখে গা থেকে পুঞ্জিত তুষার ঝেড়ে ফেলতে লাগলো। তারপর চারদিক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে টেবিলের ওপর আরাম ক'রে ব'সে মার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো, এটা কি ভাড়াটে-বাড়ি, না আপনাদের নিজেদের?

ভাড়াটে।

বাড়িটা তো বিশেষ ভালো না।

পাশা এক্ষুণি আসবে, বসো।

বসেছি তো। আচ্ছা, মা, তোমার কপালে ও দাগটা কে করে দিলে?

প্রশ্নকর্তার ঈষৎ হাস্য এবং প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে আহতা হ'য়ে মা একটু কঠিন সুরে বললেন, তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

রাগ করো না, মা। আমার মার কপালেও অমন একটা দাগ ছিল; ...তাঁর মুচি স্বামী লোহার ফর্মা দিয়ে আঘাত করেছিল কি না...ইনি ছিলেন ধোপানি, উনি ছিলেন মুচি...মাকে যে কী মার মারতেন...ভয়ে আমার গায়ের চামড়া যেন ফেটে যেতে চাইতো।

মা'র রাগ জল হয়ে গেলো এ কথায়। এরপর দু'জনের আলাপ জমে উঠলো। মা ভাবলেন, এর মতো যদি আর সবাই হয়!

আগন্তুকের নাম এণ্ড্রি।

এণ্ড্রির পর এলো একটি মেয়ে—ন্যাটাশা। মাঝারি চেহারা, মাথা-ভরা ঘন কালো চুল, সাধারণ পোশাক, হাসিমুখ, মধুর স্পষ্ট কণ্ঠ, স্বাস্থ্য-নিটোল দেহ, নিবিড় নীল দু'টি চোখ...মার প্রাণ খুশিতে, স্নেহে ভরে

উঠলো···মনে হ'ল, এ যেন তাঁরই হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে আবার তাঁর কোলে ফিরে এসেছে।

এর পরে এলো নিকোলাই—মজুর-পল্লির নামজাদা চোর বৃদ্ধ দানিয়েলের ছেলে। মা অবাক হ'য়ে বললেন, তুমি, এখানে?

পেভেল বাড়ি আছে?

না।

নিকোলাই তখন ঘরের দিকে চেয়ে বললে, সুপ্রভাত কমরেড।

ন্যাটাশা হাসিমুখে নিকোলাইর করমর্দন করলেন।

মা অবাক হয়ে গেলেন, নিকোলাইও তবে এই দলে আছে।

এর পরে এলো ইয়াকোভ—কারখানার পাহারাদার শোমোভের ছেলে। তার সঙ্গে আর একটি ছেলে—সেও অপরিচিত কিন্তু ভীষণ-দর্শন নয়।

সব্বার শেষে এলো পেভেল—কারখানার দু'জন মজুরকে সঙ্গে নিয়ে।

মা ছেলেকে প্রশ্ন করলেন ধীরে ধীরে, এরাই কি তোর সেই বে-আইনী সভার লোক?

হাঁ, বলে পেভেল কমরেডদের কাছে চলে গেলো।

মা মনে মনে বলতে লাগলেন, বলে কি, এরা তো দুধের ছেলে!

ঘরের মধ্যে ততক্ষণ মজলিস বসে গেছে। আগন্তুকদল টেবিলের চারদিকে উন্মুখ হয়ে বসেছে। এককোনে ল্যাম্পের নীচে ন্যাটাশা একখানা বই খুলে পড়ছে, 'মানুষ কেন এমন হীনভাবে জীবন-যাপন করে বুঝতে হলে···'

—'এবং মানুষ কেন এত হীন হয় বুঝতে হলে' এণ্ড্রি জুড়ে দিলো।

'আগে দেখতে হবে, কেমন ভাবে তারা জীবন-যাত্রা শুরু করেছিল...'

বই থেকে স্যাটাশা সেই আদিম অসভ্যদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী, তাদের গুহাবাস, পাথরের অস্ত্রে শিকার প্রভৃতির সরল বর্ণনা পড়ে যেতে লাগলো। মা ভাবলেন, এতো বুনো লোকদের গল্প, এতে আবার বে-আইনী কি আছে!

হঠাৎ নিকোলাইর অসন্তুষ্টি-ভরা কণ্ঠ বেজে উঠলো, ওসব যাক। মানুষ কেমন ক'রে জীবন কাটিয়েছে তা শুনতে চাইনা...শুনতে চাই, মানুষের কি রকম ভাবে বাঁচা উচিত।

'হাঁ, তাইতো।'—লাল-চুলওয়ালা একটি লোক সায় দিলো।

ইয়াকোভ প্রতিবাদ ক'রে বললো, যদি আমাদের সামনে এগোতে হয়, তবে আমাদের সব-কিছু জানতে হবে।

'নিশ্চয়ই'—কোঁকড়া চুলওয়ালা একজন ইয়াকোভকে সমর্থন করলো।

পলকে বিষম তর্কাতর্কি শুরু হ'ল, কিন্তু অশ্লীল অন্যায় ভাষা কারু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। মা ভাবলেন, ওই মেয়েটি আছে ব'লেই ওরা সামলে চলছে।

সহসা স্যাটাশা ব'লে উঠলো, থামো, শোন ভাইসব।

পলকে সবাই নীরব, স্যাটাশার দিকে নিবদ্ধ-চক্ষু।

স্যাটাশা বললো, যারা বলে আমাদের সব-কিছুই জানা উচিত, তারাই ঠিক বলছে। যুক্তির দীপ-শিখায় চলার পথ আলোকিত ক'রে নিতে হবে আমাদের—অন্ধকারে যারা আছে, তারা যাতে আমাদের দেখতে পায়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের সাধু এবং সত্য জবাব দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের থাকা চাই। যা-কিছু সত্য এবং যা-কিছু মিথ্যা,...সবার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় থাকা দরকার।

ন্যাটাশা চুপ করলে পেভেল উঠে বললো, আমাদের একমাত্র কাম্য কি পেট বোঝাই করা ?

তারপর নিজেই জবাব দিল, না। আমরা চাই মানুষ হ'তে। যারা আমাদের ঘাড়ে চেপে ব'সে আমাদের চোখ ঢেকে রেখেছে, তাদের আমরা দেখাবো,—আমরা সব দেখি, আমরা বোকা নই, পশু নই, শুধু আহার করতে চাই না,—আমরা বাঁচতে চাই মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে। আমাদের শত্রুদের আমরা দেখাব যে, বাইরে আমরা কুলি-মজুর, শ্রমদাস যা' হই না কেন, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমরা তাদের সমান, আর প্রাণশক্তিতে, তেজে, বীর্যে আমরা তাদের চাইতেও ঢের বেশি শ্রেষ্ঠ।

মার বুক ছেলের বাগ্মীতায় স্ফীত হ'য়ে উঠলো।

এণ্ড্রি বললো, দেশে আজ ভুঁড়ির ছড়াছড়ি, সাধু লোকেরই আকাল। এই পচা জীবনের জলাভূমি থেকে এক সেতু গড়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে মঙ্গলময় ভবিষ্যতের অভিমুখে। বন্ধুগণ, এই আমাদের ব্রত,—এই আমাদের করতে হবে।

দুপুর রাতে মজলিস ভাঙলো, যে যার ঘরে চ'লে গেলো।

মা বললেন, এণ্ড্রি লোকটি কিন্তু বেশ। আর ওই মেয়েটি, কে ও ?

জনৈক শিক্ষয়িত্রী।

আহা হা, গরম কাপড়চোপড় একদম নেই, ঠাণ্ডা লাগবে যে। ওর আপনার জনেরা কোথায় ?

মস্কোতে। ওর বাবা বড়লোক, লোহার কারবার, মেলাই টাকা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই দলে ভিড়েছে ব'লে। বড়-লোকের আদরিণী মেয়ে, সুখ-সম্পদে লালিত। যা' চাইতো তা পেতো, কিন্তু আজ সে একা, অন্ধকার রাতে পায়ে হেঁটে চার মাইল পথ চ'লে যায়।

মার প্রাণ পলকে ভারি হয়ে উঠলো, বললেন, শহরে যাচ্ছে ?

হাঁ।

ভয় করে না ওর ?

না।

কেন গেলো ? এখানে তো থাকতে পারতো, আমার সঙ্গে শুতো।

তা' হয়না। কাল সকালে উঠে সবাই দেখতো। আমরা তা চাই না, ও-ও চায় না।

মার মনে সেই আগেকার উদ্বেগ জেগে উঠলো, বললেন, কিন্তু আমিতো বুঝতে পাচ্ছিনা পেভেল, এর ভিতর বিপজ্জনক বা অন্যায় কি আছে ? তোরা তো আর খারাপ কিছু কচ্ছিস না।

শান্তভাবে মায়ের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে পেভেল জবাব দিলো, আমরা যা করছি, তাতে খারাপ কিছু নেই, খারাপ কিছু থাকবেও না ; কিন্তু তবু আমাদের জেলে যেতে হ'বে।

মার হাত কেঁপে উঠলো। বসা গলায় তিনি বললেন, ভগবান তোমাদের যে ক'রে হ'ক রক্ষা করবেনই।

না, মা, তোমায় আমি মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারি না ; রক্ষা আমরা কিছুতেই পাবোনা।...

মাকে শুতে ব'লে ছেলে চ'লে গেলো নিজের কামরায়।

মা একা জানালার কাছটিতে এসে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। তুষারে-ছাওয়া পথ, ঝড়ো-হাওয়ার অবিরাম মাতামাতি...তারপরেই একটা খোলা মাঠ...সাদা তুষার রাশি,...তার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে শিমুল তুলোর মতো ঘন ধারায়...বাতাস প্রলয়-বাঁশি বাজিয়ে যায়... মা দেখলেন, তারই মধ্য দিয়ে একা চলেছে ন্যাটাশা...তার পোশাক

বাতাসে দাপাদাপি করছে, পা ব'সে যাচ্ছে, মুখে-চোখে কে যেন মুঠো মুঠো তুষার ছুড়ে মারছে—ন্যাটাশা এগোতে পারছে না, ঝড়ের মুখে একগাছি কুশের মতো সে নুয়ে নুয়ে পথ বেয়ে চলেছে। ডানে তার কৃষ্ণাভ অরণ্য-প্রাচীর, নগ্নপত্রহীন গাছগুলি যেন বাতাসে ব্যথিত হ'য়ে আর্তনাদে চারিদিক পূর্ণ করে তুলেছে। দূরে…শহরের ক্ষীণাতিক্ষীণ আলো।

কী এক অভূতপূর্ব আতঙ্কে শিউরে উঠে' মা ঊর্ধ্বে চেয়ে প্রার্থনা জানান, ভগবান, রক্ষা করো।

—চার—

এমনি ক'রে দিন কাটে। ফি শনিবারে দলের লোকেরা পেভেলের বাড়িতে এসে মজলিস করে…আর এক-এক ধাপ ওপরে ওঠে…কিন্তু কোথায়, কতদূরে গিয়ে এ সিঁড়ি শেষ হয়েছে, কেউ তা জানে না। রোজ নয়া-নয়া লোক আসে, পেভেলের কামরায় আর তিলধারণের স্থান থাকেনা! ন্যাটাশাও আসে…তেমনি শ্রান্ত, ক্লান্ত কিন্তু যৌবনমদে তেম্‌নি জীবন্ত, পরিপূর্ণ। মা তার জন্য মোজা বোনেন, নিজের হাতে তার পায়ে পরিয়ে দিয়ে মাতৃস্নেহে তাকে অভিষিক্ত করেন। ন্যাটাশা প্রথমটা হাসে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে কি ভাবে। স্নিগ্ধ ধীর কণ্ঠে মাকে বলে, আমার এক ধাই…সেও আমায় এম্‌নি ভালবাসতো।…কী আশ্চর্য মা, কুলি-মজুরের এতো দুঃখ-সংকুল অত্যাচারিত জীবন…

তবু তাদের মাঝে যেটুকু প্রাণ আছে, যতটুকু সাধুতা আছে, তা' ওদের মধ্যে নেই—ব'লে হাত তু'লে সে দূরদূরান্তরের কাদের নির্দেশ করে।

মা বললেন, কিন্তু, মা, কেন তুমি নিজের আত্মীয়স্বজন সুখ-সাধ সব ত্যাগ করে এসেছো ?

ম্লান হাস্যে ন্যাটাশা বলে, আত্মীয়স্বজন, সুখ-সাধ···কিছু নয় মা ! শুধু মার কথা ভেবে কষ্ট হয়···তোমারই মতো সে···মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় তাঁকে দেখি।

মা মাথা নেড়ে দুঃখিত কণ্ঠে বলেন, আহা, বাছা আমার !

ন্যাটাশা কিন্তু জবাবে খিলখিল করে হেসে ওঠে, বলে, না, মা, দুঃখ কোথায় ! মাঝে মাঝে এতো আনন্দ, এতো সুখ আমি পাই···বলতে বলতে তার মুখ প্রশান্ত হয়, তার নীল চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মার কাঁধে হাত রেখে স্বপ্নাবিষ্টের মতো শান্ত, আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় বলে, যদি জানতে, মা, যদি বুঝতে কী মহান্, কী আনন্দময় কাজ আমরা ক'রে যাচ্ছি—একদিন বুঝবে !

মার যেন ঈর্ষা হয় ন্যাটাশার ওপর, বলেন, আমি বুড়ো, বোকা, কিইবা বুঝি।

পেভেলের বক্তৃতা ক্রমশ বাড়ে। আলোচনার সুর ক্রমশ চড়তে থাকে···আর তার শরীর হয় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। সে যখন ন্যাটাশার সঙ্গে কথা কয়, মা দেখেন যেন তার কণ্ঠ মধুর, তার দৃষ্টি কোমল, তার সমস্ত চেহারা সহজ সরল হ'য়ে আসে। ন্যাটাশাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা ক'রে মা অন্তরে অন্তরে পুলকিত হ'য়ে ভগবানকে বলেন, তাই করো ঠাকুর।

আলোচনার সুর যখন সপ্তমে ওঠে, এণ্ড্রি সটান দাঁড়িয়ে তাদের কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তর্কাতর্কি বাঁধাবার প্রধান পাণ্ডা নিকোলাই। তার দলে শ্যামোয়্লোভ, আইভান বুকিন এবং ফেদিয়া মেজিন। ইয়াকোভ, পেভেল, এণ্ড্রি অন্য দলে।

মাঝে মাঝে ন্যাটাশার বদলে আসেন অ্যালেক্সি আইভানোভিচ। তার আলোচ্য বিষয় অতি সাধারণ—পারিবারিক জীবন-যাত্রা, ছেলেপিলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুলিস, রুটি ও মাংসের দাম, এইসব···প্রত্যেকটা জিনিসে তিনি দেখতে পান জাল-জুয়াচুরি, বিশৃঙ্খলা, বোকামি। মাঝে মাঝে তা' নিয়ে ঠাট্টাও করেন, কিন্তু সবসময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, মানুষের জীবন এসবের ফলে কতো অসহজ এবং অসুবিধাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর একটি মেয়েও প্রায়ই আসে শহর থেকে। নাম তার শশেংকা, লম্বা সুগঠিত দেহ, পাতলা গম্ভীর মুখ, সমস্ত অঙ্গ দিয়ে যেন একটা তেজ ফুটে বেরুচ্ছে, কী এক অজ্ঞাত রোষে যেন তার কালো ভুরু কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। যখন কথা বলে, পাতলা নাকের পাতা কাঁপতে থাকে, সে-ই প্রথম উচ্চারণ করলো, আমরা সোশিয়ালিস্ট। রুদ্র, রুক্ষ তার কণ্ঠ।

মা শুনেই নির্বাক আতংকে মেয়েটির দিকে চাইলেন, কিন্তু শশেংকা চক্ষু অর্ধ-মুদ্রিত ক'রে দৃঢ়-কঠিন কণ্ঠে বললো, এই নবজীবন গঠন-ব্রতে আমাদের সমগ্র শক্তি দান করতে হবে,—আর আমাদের একথাটা বুঝতে হবে যে, এ দানের কোনো প্রতিদান আমরা পাবো না।

সোসিয়ালিস্ট কথাটার সঙ্গে মা পরিচিত। বাল্যে গল্প শুনতেন, চাষাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে দেওয়ায় জমিদাররা জারের ওপর রেগে গিয়ে পণ করেন, জারের মুণ্ডচ্ছেদ না ক'রে চুল ছাঁটবো না। এরাই নাকি সোশিয়ালিস্ট, এরাই তখন জারকে খুন করে। তবে? তাঁর ছেলে এবং এরা সব সেই সোশিয়ালিস্ট হ'ল কি ক'রে?

সব চলে গেলে ছেলেকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, হাঁরে, তুই কি সোশিয়ালিস্ট ?

হাঁ। কেন বলতো, মা ?

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে চোখ নামিয়ে মা বললেন, পাভ্লুশা, তোরা জারের বিরুদ্ধে কেন ? একজন জারকে তারা খুন করেছিলো।

পেভেল পায়চারি করতে করতে হেসে বললো, কিন্তু আমরা ও করতে চাই না, মা। মাকে বহুক্ষণ ধরে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বোঝালো। মা তার মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, পেভেল কোনো খারাপ কাজ করবে না—করতে পারে না।

কিন্তু শশেংকার ওপর মা তেমন খুশি নন। কথাপ্রসঙ্গে এণ্ড্রিকে একদিন বললেন, শশেংকা কি কড়া মেয়ে, বাবা! খালি হুকুম, এ করো, ও করো।

এণ্ড্রি হেসে বললে, তুমি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছ, মা।

পেভেল নীরস কণ্ঠে বললো, কিন্তু সে মেয়ে ভালো।

এণ্ড্রি বললো, একশোবার···শুধু সে এইটে বোঝে না যে···

তারপরেই দু'জনের মধ্যে যে তর্কাতর্কি শুরু হল, মা তার খেই ধরতে পারলেন না।

মা লক্ষ্য করতেন, শশেংকা পেভেলের সঙ্গে এত রূঢ় ব্যবহার করে, এমন-কি মাঝে মাঝে তিরস্কারও করে, তবু পেভেল কিছু বলে না, চুপ ক'রে থাকে, হাসে, ন্যাটাশার দিকে যেমন ক'রে চাইতো তেমনি ক'রে তার দিকে চায়। এটা মা সইতে পারতেন না।

মজলিসের বৈঠক ঘন ঘন, হপ্তায় দু'দিন করে চলতে লাগলো। নতুন নতুন গানের আমদানি হল···সুরের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুতে

লাগলো এক দুর্দমনীয় শক্তি। নিকোলাই গম্ভীরভাবে বলতো, এবার রাস্তায় বেরিয়ে এ গান গাইবার সময় এসেছে।

মাঝে মাঝে তারা আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে বিদেশী শ্রমিক ভাইদের জয়-যাত্রার সংবাদে। তাদের নামে জয়ধ্বনি করে, তাদের অভিনন্দিত ক'রে চিঠি পাঠায়, দুনিয়ায় যেখানে যত শ্রমিক আছে, তাদের সঙ্গে নিজেদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ মনে করে, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে।

মার চিত্তও ধীরে ধীরে এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে! এণ্ডিকে সম্বোধন করে একদিন তিনি বলেন, কি মজার লোক তোমরা! কোথাকার কোন্ আর্মেণিয়ান, ইহুদী, অস্ট্রিয়ান···সব তোমাদের কমরেড···সবাইকে বল তোমরা বন্ধু···সবার জন্য দুঃখ কর, সবার সুখে উৎফুল্ল হও।

এণ্ডি বললো, সবার জন্যই আমরা দাঁড়িয়েছি, মা! এই দুনিয়াটা আমাদের শ্রমিকদের···আমাদের কাছে কোন জাতি নেই, কোন বর্ণ নেই—আমাদের কাছে আছে শুধু মিত্র এবং শত্রু। দুনিয়ার নিখিল শ্রমিক আমাদের কমরেড। ধনী এবং কর্তারদল আমাদের দুশমন··· দুনিয়ার দিকে যখন চেয়ে দেখি, শ্রমিক আমরা কতো অসংখ্য, কী বিপুল আমাদের প্রাণ-শক্তি, তখন হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে, সুখে উদ্বেল হয়, বুকের মধ্যে উৎসবের বাঁশি বাজতে থাকে। ঐ ফরাসী শ্রমিক, জার্মান শ্রমিক, ইতালিয়ান শ্রমিক···জীবনের দিকে যখন চায়, ওরাও এমনিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। একই মায়ের সন্ততি আমরা, বিশ্বের সকল দেশের সকল শ্রমিকের ভ্রাতৃবন্ধনে আমাদের নবজন্ম। এই বন্ধন ক্রমশ প্রবল হচ্ছে, সূর্যের মতো আমাদের দীপ্ত করে তুলছে—এ যেন ন্যায় গগনে সমুদিত নবসূর্য এবং এ গগন শ্রমিক হৃদয়েরই অভ্যন্তরে। সে

যেই হক্‌ না, যা-ই তার নাম হ'ক্‌, সোসিয়ালিস্ট মাত্রেই আমাদের ভাই—আজ, চিরদিন, যুগ-যুগান্ত ধ'রে।

মা তাদের শক্তি-দীপ্ত আননের দিকে চেয়ে অনুভব করেন, সত্যি সত্যিই বিশ্বাকাশে তার চোখের আড়ালে এক নব দীপ্তোজ্জ্বল জ্যোতির আবির্ভাব হয়েছে···আকাশের সূর্যের মতোই যা মহান।

এমনি করে তাদের চাঞ্চল্য বেড়ে চলে। পেভেল মাঝে মাঝে বলে, একটা কাগজ বের করা দরকার।

নিকোলাই বলে, আমাদের নিয়ে কানা-ঘুষো চলছে পাড়ায়। এখনই সরে পড়া ভাল।

এণ্ড্রি জবাব দেয়, কেন এতো ধরা পড়ার ভয়!

মা এণ্ড্রিকে ভালবেসে ফেলেছেন নিজের ছেলের মতো। কাজেই তিনিই একদিন প্রস্তাব করলেন পেভেলের কাছে, এণ্ড্রি এখানেই থাকুক না। তা'হলে আর তোদের ওর বাড়ি ছুটাছুটি ক'রে হয়রান হ'তে হয় না।

পেভেল বললে, ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ কি, মা।

ঝঞ্ঝাট···তাতো চিরটা জনমই পুইয়ে এসেছি··· অমন ভালো ছেলের জন্য পোহানো তো বরঞ্চ সার্থক!

পেভেল বললো, তাই হ'ক মা, এণ্ড্রি এলে আমি সুখীই হ'ব।

কাজেই এণ্ড্রি এসে মার আর একটি ছেলে হ'য়ে বসলো।

—পাঁচ—

নিকোলাই কিছু মিথ্যা বলেনি,—পেভেলের বাড়িটা সমস্ত পল্লির ভীতি, আতঙ্ক এবং সন্দেহের কেন্দ্র হ'য়ে পড়লো। চারপাশে সময়ে-অসময়ে নানান প্রকৃতির লোক নিঃশব্দে ঘু'রে বেড়ায়—বাড়ির গোপন রহস্য ভেদ করবে ব'লে। তাড়িখানার মালিক··· বুড়ো একদিন মাকে পথে পেয়ে বললো, কেমন আছো গো? তোমার ছেলের খবর কি? বিয়ে দিচ্ছ না কেন? বিয়ে দিয়ে দিলেই তোমাদের পক্ষে মঙ্গল। আর বিয়ে হলে মানুষও সামাল থাকে। আমি হ'লে কবে বিয়ে দিয়ে দিতুম। কী দিন-কাল পড়েছে বোঝতো···'মানুষ' নামধেয় পশুটির ওপর এখন কড়া নজর রাখা দরকার। মানুষ এখন মগজ খাটিয়ে বাঁচতে চায়, চিন্তা ক'রে ক'রে তারা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে। এমন-সব কাজ করছে, যা দস্তরমতো অন্যায়। গির্জায় যায় না, মেলায়-মহোৎসবে যোগ দেয় না, খালি আনাচে-কানাচে ব'সে দল পাকায় আর ফিস-ফাস করে। এতো ফিস-ফাস কেন বাপু?

ফিস-ফাস না ক'রে খোলাখুলি তাড়িখানার লোকেদের সামনে দাঁড়িয়ে বলুক না—সে সাহস নেই। আমি জানতে চাই, কি এ? গোপনীয়? গোপনীয় স্থান একমাত্র পবিত্র গির্জা···অন্য-সব কোনায় ব'সে কানাঘুষ্-ঘুষি ভ্রান্তি, মায়া, বুঝলে···

লম্বা বক্তৃতা শেষ ক'রে বুড়ো চলে গেলো। মা বিব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপরে সাবধান করে গেলো এক পড়শী বুড়ি। মা বাড়ি এসে ছেলেদের সব খুলে বললেন—তোরা বিয়ে করছিস না,

মদ খাচ্ছিস না, অথচ সন্দেহজনক মেয়েদের সঙ্গে মিশছিস···তাই পাড়ার সব, বিশেষত, মেয়েরাও তোদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

পেভেল বিরক্ত হ'য়ে বললো, বেশ, যাক।

এণ্ড্রি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললো, আস্তাকুঁড়ে সব-কিছুতেই পচা গন্ধ। বোকা মেয়েগুলোকে তুমি কেন বুঝিয়ে দিলে না, মা, যে, বিয়ে কী চিজ। তা'হলে তারা হাড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দেবার জন্য এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠতো না।

মা বললেন, তারা সবই দেখে, বাবা, সবই জানে, জানে তাদের ভবিষ্যত কতো দুঃখময়! কিন্তু কি করতে পারে তারা? আর কোন পথ নেই তাদের।

পেভেল বললো, বুদ্ধিই তাদের মোটা, নইলে পথ তারা খুঁজে পেতো।

মা বললেন, তোরাই কেন তাদের বুদ্ধি শোধরাস না, বাবা? বুদ্ধিমতী যারা তাদের ডেকে দুটো কথা বল্না!

কিছু হ'বে না তাতে—পেভেল জবাব দিল।

এণ্ড্রি বললো, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক না।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পেভেল বললো, হাঁ, আজ কাজের নাম ক'রে মেয়েদের সঙ্গে মিশবে, কাল হাত ধরাধরি ক'রে জোড়ায় জোড়ায় বেড়াবে, তারপর হবে বিয়ে। বাস্···সব শেষ জীবনের।

মা ছেলের এই বিবাহ-বিমুখতায় চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন।

একদিন মা শুয়েছেন ঘুমুবেন ব'লে—ও কামরায় এণ্ড্রি-পেভেল কি কথা বলছে শুনতে পেলেন।

এণ্ড্রি বলছে, তুমি জানো ন্যাটাশাকে আমি পছন্দ করি?

জানি।

ন্যাটাশা কি এটা লক্ষ্য করেছে ?

পেভেল নিরুত্তরে ভাবতে লাগলো। এণ্ড্রি স্বর আরো নীচু ক'রে বললো, কি মনে হয় তোমার ?

লক্ষ্য করেছে, আর সেই জন্যই সে মজলিসে আসা ছেড়ে দিয়েছে।

এণ্ড্রি নীরব উদ্বেগে খানিকক্ষণ পায়চারি করে বললো, যদি আমি তাকে একথা বলি ?

কি কথা ?···বন্দুকের গুলির মতো পেভেলের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়লো।

চাপা গলায় এণ্ড্রি বললো—যে আমি···।

পেভেল বাধা দিয়ে বললো, কেন ?

এণ্ড্রি বাধা পেয়ে মুহূর্তেক স্তব্ধ থেকে একটু হেসে বললো, দেখো বন্ধু, কোন মেয়েকে যদি তুমি ভালোবাসো, তাকে সেটা বলা চাই ; নইলে ভালোবাসাটাই বৃথা।

সশব্দে পাঠ্য বইখানা বন্ধ ক'রে পেভেল বললো, কিন্তু তাতে ফয়দা হ'বে কি বলতে পারো ?

"অর্থাৎ ?" এণ্ড্রি জিগ্যাসুনয়নে পেভেলের দিকে চাইলো।

পেভেল ধীরে ধীরে বললো, এণ্ড্রি, কি তুমি করতে যাচ্ছ, সে সম্বন্ধে তোমার মনে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। ধরে নিলুম, সেও তোমাকে ভালোবাসে, যদিও আমি তা' বিশ্বাস করিনা, তবু ধ'রে নেওয়া গেলো। তারপর বিয়ে হ'ল। চমৎকার মিলন—পণ্ডিতের সঙ্গে মজুরানির সংযোগ। তারপর এলো পুত্রকন্যার বন্যা···পরিবারের জন্যই তোমাদের ব্যস্ত থাকতে হবে···সংসারের শতকরা নিরানব্বুই জন যেমন ক'রে

জীবন কাটায়, তোমারও তেমনি কাটবে। তোমাদের এবং ছেলে-মেয়েদের জন্য আহারের রুটি এবং বাসের কুটিরের সংস্থান করতে করতে জীবন কাটাবে। যে ব্রত নিয়ে আমরা নেবেছি, তার পক্ষে তোমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবেনা—তোমার এবং ন্যাটাশার!

এণ্ড্রি চুপ ক'রে রইলো। পেভেল এবার সুর নরম করে বললো, এসব, ছেড়ে দাও এণ্ড্রি। একটা মেয়েকে নিয়ে মজে যেয়োনা, স্থির হও,—এই হচ্ছে একমাত্র শ্রেয় পথ।

এণ্ড্রি বললো, কিন্তু আলেক্‌সি আইভানোভিচ কি বলেছিলেন মনে আছে? মানুষকে পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে হ'বে···দেহের এবং আত্মার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে,—মনে আছে পেভেল!

পেভেল সোজা জবাব দিলো, সে আমাদের জন্য নয়, এণ্ড্রি? পরিপূর্ণ জীবন কি করে লাভ করবে তুমি···তা যে তোমার নাগালের বাইরে। এণ্ড্রি, যদি ভবিষ্যৎকে ভালোবাসো, ভবিষ্যৎকে চাও, তবে বর্তমানের সব-কিছু তোমায় ত্যাগ করতে হ'বে—সব-কিছু।

মানুষের পক্ষে তা' শক্ত—এণ্ড্রি বললো।

কিন্তু আর কি করার আছে? ভেবে দেখো।

এণ্ড্রি আবার চুপ···ঘড়ির টিক টিক শব্দে যেন জীবন থেকে এক একটা মুহূর্ত কেটে নিচ্ছে।···শেষে এণ্ড্রির কথা ফুটলো, আদ্দেক প্রাণ বাসে ভালো, আদ্দেক করে ঘৃণা!—এই কি প্রাণ?

আমি জিগ্যেস করি, তোমার আর কি করার আছে?···ব'লে পেভেল বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলো।

তা হ'লে আমার চুপ করে থাকতে হবে?

হাঁ, তাই উচিত।

বেশ, তাই হবে। এই পথেই চলবো আমরা, কিন্তু পেভেল তোমার যখন এদিন আসবে তখন তোমার পক্ষে শক্ত হ'বে এ আদর্শ।

শক্ত এখনই হয়েছে, এণ্ড্রি।

বলো কি!

হ্যাঁ!

এণ্ড্রি চুপ করে গেলো, বুঝলো পেভেলও কোন মেয়েকে ভালোবেসেছে……কিন্তু ব্রতের খাতিরে প্রেমকে সে দমন করে রেখেছে। পেভেল যা' পেরেছে, সে কেন তা' পারবে না! নিশ্চয়ই পারবে।

পল্লিময় হুলস্থুল—সোসিয়ালিস্টরা লাল-কালিতে-ছাপা ইস্তাহার ছড়াচ্ছে মজুরদের মধ্যে। তাতে কারখানার মজুরদের শোচনীয় অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো ক'রে লেখা, কোথায় কোন্ ধর্মঘট হচ্ছে তার ফিরিস্তি,…সর্বশেষে মজুদেব সংঘবদ্ধ হ'য়ে স্বার্থরক্ষাকল্পে লড়াই করবার জন্যে উত্তেজনাপূর্ণ আবেদন।

মোটা মাইনে যারা পায়, তারা সোশিয়ালিস্টদের গাল দিয়ে ইস্তাহার নিয়ে কর্তাদের কাছে জমা দেয়। তরুণরা সাগ্রহে প্রত্যেকটি কথা গেলে, উত্তেজনায় চঞ্চল হ'য়ে বলে, সত্যিই তে, তাই! কিন্তু বেশির ভাগই শ্রমক্লান্ত—নিরাশ হৃদয়। ঘাড় নেড়ে বলে, হুজুগ, হুজুগ—ওতে কিছু হ'বে না, হবার জো নেই। সে যা' বলুক সবার প্রাণেই কিন্তু একটা চাঞ্চল্য…একদিন যদি দেরি হ'ল ইস্তাহার বের হ'তে অমনি আলোচনা আজো বেরুলোনা, ছাপা বন্ধ হয়ে গেলো বুঝি! তারপর সোমবারে ইস্তাহার বেরুলে আবার আন্দোলন!

মা জানতেন, এসবের মূলে তাঁরই ছেলে। তাঁর আনন্দও হ'ত, শঙ্কাও হ'ত। একদিন সন্ধ্যায় এসে সেই পড়শী বুড়ি খবর দিয়ে গেলো, নাও এইবার, ঠ্যালা সামলাও; আজ রাতেই পুলিস আসছে, তোমাদের বাড়ি আর নিকোলাইদের বাড়ি, আর মেজিনদের বাড়ি…

মা ধপ্ ক'রে চেয়ারে বসে পড়লেন,—তাঁর মাথা ঘুরছে, সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু ছেলের আসন্ন বিপদের কথা মনে পড়তেই সাহসে তাঁকে বুক বেঁধে উঠতে হল। প্রথমেই তিনি মেজিনকে খবরটা দিয়ে এলেন,—মেজিন বলে দিলো, তুমি যাও, মা, ওদের আমি খবর পাঠাচ্ছি। পুলিস বেড়ায় ডালে ডালে, আমরা বেড়াই পাতায় পাতায়।

মা বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত কাগজপত্র বই বুকে গুঁজে অস্থির-ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন…মনে করলেন, পেভেল এক্ষুণি কাজ ফেলে ছুটে বাড়ি আসবে। কিন্তু পেভেল এলো না। মা অবসন্ন হ'য়ে রান্নাঘরের বেঞ্চের ওপর ব'সে পড়লেন—পেভেল ও এণ্ড্রি কারখানা হ'তে ফিরে এলো…মা তখনো সেই অবস্থায় ব'সে। জিগ্যেস করলেন, জানো সব ?

হাঁ। তোমার কি ভয় হচ্ছে, মা ?—পেভেল জিগ্যেস করলো।

এণ্ড্রি বললো, ভয় করে লাভ কি ? ভয় করলে কি বিপদ উদ্ধার হয় ? হয় না, তবে ?

পেভেল বললো, উনুনটিও বুঝি ধরাওনি, মা !

মা বইগুলি চেপে বসেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তা' দেখিয়ে বললেন, ঐগুলো নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম, সারাক্ষণ…

এণ্ড্রি. পেভেল হেসে উঠলো...মা যেন এতে আশ্বস্ত হলেন। পেভেল খানকয়েক বই বেছে নিয়ে উঠানে লুকিয়ে রাখলো। এণ্ড্রি মাকে সাহস দেবার জন্য গল্প জুড়ে দিলো, কিছু ভয় নেই, মা। ওদের জন্য আমার আপসোস হয়, মা, ইয়া হোমরা চোমরা প্রবীণ অফিসার, তলোয়ার ঝুলিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কাজটা কি করেন? এ কোন খোঁজেন, ও কোন খোঁজেন, বিছানাটা ওলটান, মুখে কালি-ঝুল মাখেন —তারপর বিজয়ী বীরের মতো চ'লে যান। একবার ওদের পাল্লায় পড়েছিলুম, মা। জিনিসপত্র তছনছ ক'রে আমায় ধ'রে নিয়ে গেলো। তারপর জেলে রাখলো চার মাস। সে কী জীবন...কেবল বসে থাকা, আল্‌সে হয়ে...তারপর ডেকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলো। দু'দিকে পাহারা...আদালতে গেলুম...যা-তা জিগ্যেস করলো...তারপর আবার জেলে পাঠালো। তারপর এ জেল থেকে সে জেল, এখান থেকে সেখানে। এমনি ধারা। কি করবে? মাইনে খায়, বেচারীদের যা হ'ক একটা-কিছু ক'রে দেখাতে হবে তো!

মার মনে যতটুকু ভয় জমে উঠেছিল তা' নিঃশেষে মিলিয়ে গেলো।

—ছয়—

পুলিস এলো একমাস পরে অপ্রত্যাশিতভাবে। দুপুর রাত, নিকোলাই, এণ্ড্রি, পেভেল গল্প করছে...মা অর্ধ-নিদ্রিতা।

এণ্ড্রি কি কাজে রান্নাঘরে গিয়েই হঠাৎ ফিরে এলো ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে, পুলিসের সাড়া পাচ্ছি।

মা বিছানা থেকে উঠে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে। পেভেল মাকে শুইয়ে দিয়ে বললো, শুয়ে থাকো, মা, তুমি অসুস্থ।

স্থানীয় চৌকিদার ফেদিয়াকিনকে সঙ্গে ক'রে পুলিসের এক কর্তা এসে ঢুকলেন। মাকে দেখিয়ে পেভেলের দিকে চেয়ে ফেদিয়াকিন বললো, এই হুজুর ওর মা—আর ঐ হ'ল পেভেল।

কর্তা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, তুমি পেভেল ভ্লাশভ?

হাঁ।

তোমার বাড়ি খানাতল্লাশ করব। এই বুড়ি, ওঠ্…

হঠাৎ কি একটা শব্দে সন্দিগ্ধ হ'য়ে কর্তা পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, কে তুমি? নাম কি তোমার?…

তারপর খানাতল্লাশী চললো…জিনিসপত্রগুলো তছনছ ক'রে… বইগুলো খুশিমতো এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলে'। এ অন্যায় অত্যাচার আর সইতে না পেরে নিকোলাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলো, বইগুলো মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলার কি দরকার?

মা নিকোলাইর সাহস দেখে বিস্মিত, তার পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। কর্তা রক্তচোখে নিকোলাইর দিকে চাইতে লাগলেন। মা পেভেলকে বললেন, নিকোলাই চুপ থাকুক না কেন!

কর্তা ধমক দিয়ে বললেন, কি কথা হচ্ছে! চুপ…এ বাইবেল পড়ে কে?

পেভেল বললো, আমি।

এসব বই কার?

আমার।

কর্তা তখন নিকোলাইর দিকে ফিরে বললেন, তুমিই বুঝি এণ্ড্রি?

হাঁ।

পরক্ষণেই এণ্ড্রি তাকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এসে বললো, ও নয়, আমি এণ্ড্রি।

কর্তা নিকোলাইর দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললেন, হুঁশিয়ার! তারপর পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের ক'রে ঘেঁটে এণ্ড্রিকে বললেন, এণ্ড্রি, রাজনৈতিক অপরাধে এর আগেও তোমার খানাতল্লাশ হয়েছিল?

হাঁ, রস্টোভ এবং সারাটোভে। তবে সেখানকার পুলিসের ভদ্রতা-জ্ঞান ছিল। আমার নামের আগে মিস্টার যোগ দিতে অবহেলা করেনি!

কর্তা ডান চোখ কুঁচকে, রগড়ে, চকচকে সাদা দাঁতগুলি বের ক'রে বললেন, তা' মিস্টার এণ্ড্রি, তুমি কি জানো কোন্ বদমাশরা এই বে-আইনী ইস্তাহার আর বই বিলি ক'রে বেড়ায়?

এণ্ড্রি জবাব দিবার আগেই নিকোলাই ব'লে উঠলো, বদমাশ আমরা প্রথম দেখছি এখানে।

কর্তা হুকুম করলেন, শুয়োরকে নিয়ে যাও এখান থেকে।

দু'জন সৈনিক নিকোলাইকে বের করে নিয়ে গেলো। খানাতল্লাশ শেষ হ'লে কর্তা বললেন, মিস্টার এণ্ড্রি নাখোদ্‌কা, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।

কি অপরাধে?

পরে বলবো। তারপর মার দিকে চেয়ে বললেন, লিখতে পড়তে জানো, বুড়ি?

জবাব দিল পেভেল, না।

কর্তা ধমক দিয়ে বললেন, তোমায় কে জিগ্যেস করেছে ! বুড়ি বলবে।

মার মনে রি-রি করে উঠলো একটা অপরিসীম ঘৃণা। কর্তার মুখের সামনে হাত নাচিয়ে বললেন, চেঁচিওনা, এখনো তুমি বড় হওনি। জানো না, কী দুঃখ, কী বেদনা···

পেভেল বললো, স্থির হও মা !

এণ্ড্রি বললো, বুকের ব্যথা দাঁত দিয়ে চেপে থাকা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই, মা।

মা সে কথা কানে তুললেন না, চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন তোমরা এমন ক'রে মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও ?

কর্তাও চড়া সুরে জবাব দিলেন, সে জবাব তুমি চাইতে পারোনা। চুপ কর···

মা ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো ফুলতে লাগলেন।

কর্তা তখন হুকুম দিলেন, নিকোলাইকে হাজির কর।

সৈন্যেরা দু'জনে দু'হাত ধ'রে নিকোলাইকে নিয়ে এলো। নিকোলাইর মাথায় টুপি···কি একটা দলিল পড়তে পড়তে কর্তার সেটা খেয়াল হল। পড়া বন্ধ ক'রে তিনি গর্জে উঠলেন, টুপি নাবাও···

নিকোলাই একটু রসিকতা করে বললো, আজ্ঞে হুজুর, আমার তো একখানা তৃতীয় হাত নেই যে আপনার হুকুম তামিল করব। দেখছেন, দু'জনে দু'হাত ধ'রে।

কর্তা একটু অপ্রস্তুত হ'লেন। তারপর নিকোলাই এবং এণ্ড্রিকে ধ'রে নিয়ে চলে গেলেন।

পেভেল বন্ধুদের হাসিমুখে বিদায় দিলো, আবেগে বলে উঠলো, আণ্ড্রে, নিকোলে ভাই !

তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, পুলিস দু'জনকে ধ'রে তাকে যে ছুঁলোওনা, এ তাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই না। তাকে কেন এই সঙ্গে ধ'রে নিয়ে গেলোনা!

মা সান্ত্বনার সুরে বললেন, নেবে বাবা, নেবে—দু'দিন সবুর কর।

পেভেল বললো, সত্যিই নেবে, মা।

মা ব্যথিত হয়ে বললেন, তুই কি নিষ্ঠুর, পেভেল! একবারও যদি প্রবোধ দিস! আমি একটা আশঙ্কার কথা বললে, তুই বলিস তার চাইতেও ভয়ংকর-কিছু।

পেভেল মার দিকে চাইলো, তাঁর কাছটিতে এগিয়ে এলো, তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমি যে পারি না, মা, তোমায় মিথ্যে প্রবোধ দিতে পারি না…তোমার যে সব সইতে হবে, সব শিখতে হবে, মা!

—সাত—

পরদিন জানা গেলো, বুকিন, শ্যামোয়লোভ, শেমোভ এবং আরো, পাঁচজন ধরা পড়েছে। ফেদিয়া মেজিন এসে সগর্বে খবর দিয়ে গেলো, তার বাড়িও খানাতল্লাশ হয়েছে, তবে তাকে ধরেনি।

মিনিট কয়েক পরে প্রতিবেশী রাইবিন এলেন। রাইবিন বৃদ্ধ, বহুদর্শী এবং তথাকথিত ধর্ম-পদ্ধতির ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। পেভেলের সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার আলাপ জমে উঠলো। বললেন, তোমরা মদ খাওনা, খারাপ কিছু করনা, তাই সবাই তোমাদের সন্দেহ করে।

এই-ই দুনিয়ার হাল! কর্তারা বলেন, তোমরা নাস্তিক…গির্জায় যাওনা, যদিও আমিও তথৈবচ। তারপর…ঐ বে-আইনী ইস্তাহারগুলি, ওগুলোও তো তোমরা ছড়াও, নয়?

হাঁ।

মা ভয়ে ভয়ে তা' ঢাকতে চান। তারা কেবল হাসে।

রাইবিন বলে, বেশ সুচিন্তিত লেখা, লোককে মাতিয়ে তোলে। সবসুদ্ধ বারোটা বেরিয়েছে, নয়?

হাঁ।

সবগুলিই আমি পড়েছি।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে পেভেল অগ্নিগর্ভ ভাষায় ব্যক্ত ক'রে যেতে লাগলো, ধর্ম, রাজা, রাষ্ট্র-শাসন, কারখানা, দেশ-বিদেশের মজুর জীবন সম্বন্ধে তার অভিমত। রাইবিন হেসে বললেন, তরুণ তুমি, লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তোমার খুবই কম।

পেভেল বললো, কে তরুণ, কে বৃদ্ধ, সে কথা ছেড়ে দিন; কার চিন্তার ধারা সত্য, তাই দেখুন।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতারিত হয়েছি, এইতো? তা' আমারও মত তাই। আমিও বলি, আমাদের ধর্ম মিথ্যা, ধর্ম আমাদের ক্ষতি করেছে।

মা এই নাস্তিক্যবাদে শিউরে উঠে' বলেন, ঈশ্বরের কথা যখন ওঠে একটু সতর্ক হ'য়ে কথা কয়ো।…যে কাজ তোমরা করছ, তাই তোমাদের জীবনে সান্ত্বনা জোগায়, কিন্তু আমার ঈশ্বর ছাড়া যে কিছুই নেই। তাঁকে কেড়ে নিলে আমি দুঃখে কষ্টে কার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াব!

পেভেল বললো, তুমি আমাদের কথা বুঝলে না, মা। যে মঙ্গলময় দয়াল ঈশ্বর তোমার উপাস্য, আমি তাঁর কথা বলিনি; আমি বলেছি, সেই ঈশ্বরের কথা, যাকে দিয়ে পুরুতের দল আমাদের শাসিয়ে রাখে, যার দোহাই দিয়ে মুষ্টিমেয়ের অন্যায় ইচ্ছার সম্মুখে আমাদের মাথা নোয়াতে বাধ্য করে।

রাইবিন টেবিল চাপড়ে বলেন, ঠিক বলেছ। ওরা আমাদের ঈশ্বরকে ভেঙে চুরে ওদের কার্যোপযোগী ক'রে নিয়েছে। ওদের হাতে যা-কিছু সব আমাদের বিরুদ্ধে। গির্জ্জায় ঈশ্বরের আমদানি শুধু আমাদের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখার জন্য— এ ঈশ্বরকে বদলে ফেলতে হ'বে, মা,—

মা ব্যথিত হ'য়ে চ'লে গেলেন সেখান থেকে।

রাইবিন পেভেলকে বলেন, দেখছো, এর আরম্ভ কোথায়! মাথায় নয়, হৃদয়ে। আর হৃদয় এমন স্থান যে, ও ছাড়া আর কিছু জন্মায় না তাতে।

পেভেল দৃঢ়কণ্ঠে বললো, যুক্তি—একমাত্র যুক্তিই মানুষকে মুক্তি এনে দেবে।

রাইবিন বললেন, কিন্তু যুক্তি তো শক্তি দিতে পারে না—শক্তির একমাত্র উৎস—হৃদয়।

পেভেল রাইবিনে এমনি ক'রে অনেক কথা কাটাকাটি চললো।

শেষটা রাইবিন বললেন, আমাদের কইতে হ'বে শুধু বর্ত্তমানের কথা···ভবিষ্যতে কি হবে তা' আমাদের অজ্ঞাত। মানুষকে 'মুক্ত' ক'রে দাও, তারপর সে নিজেই বেছে নেবে, তার পক্ষে কোন্‌টা ভালো। তাদের মগজে ঢের বিদ্যা আমরা ঢুঁসে দিয়েছি, এবার এর

অবসান হ'ক,—মানুষকে তার নিজের পথ নিজেকে খুঁজে নিতে দাও। হয়তো তারা চাইবে সমস্ত-কিছু বর্জন করতে—সমস্ত জীবন, সমস্ত জ্ঞান ;—হয়তো তারা দেখবে সকল বন্দোবস্তই তাদের বিরুদ্ধে। তুমি শুধু তাদের হাতে বইগুলি দিয়ে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ; সব প্রশ্নের উত্তর তারা নিজেরাই দেখে নিতে পারবে। তাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দাও যে, ঘোড়ার লাগাম যত কষাণো হয়, তত সে ছোটে কম।

মা ক্রমে ক্রমে এ সব শুনতে অভ্যস্ত হন।

—আট—

পেভেলের বাড়িটা মজুরদের মস্ত বড় একটা ভরসাস্থল হ'য়ে পড়লো। কোন্ অবিচার অত্যাচার হ'লেই মজুররা পেভেলের কাছে বুদ্ধি নিতে আসে। পেভেলকে সবাই শ্রদ্ধা করে, বিশেষত সেই 'কাদা-মাখা পেনি'র গল্পটা বের হবার পর।...

কারখানার পেছনে একটা জলাভূমি ছিল...বুনো গাছে ভর্তি...পচা জল...গরমের দিনে তা' পচে দুর্গন্ধ হয়, মশা জন্মায় ; ফলে, চারদিকে জ্বরের ধুম লেগে যায়। জায়গাটা অবশ্য কারখানার সম্পত্তি ; নতুন ম্যানেজার এসে দেখলেন, জলাটা খুঁড়লে বেশ মোটা টাকার পিট্ মিলবে, কিন্তু খুঁড়তে বড় কম খরচ হ'বে না। অনেক ভেবে তিনি বিনা খরচায় কাজ হাসিল করার একটা চমৎকার মতলব ঠাওরালেন।

পল্লির স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পেই যখন জলাটা সাফ করা আবশ্যক তখন

পল্লিবাসী মজুররাই ন্যায়ত তার খরচা বহন করতে বাধ্য; অতএব তাদের মজুরি থেকে রুবেলে এক কোপেক ক'রে এই বাবদ কেটে নেওয়া হ'বে। মজুররা তো একথা শুনেই ক্ষেপে উঠলো, বিশেষ ক'রে যখন দেখলো কর্তার পেয়ারের কেরানীবাবুরা এ ট্যাক্স থেকে রেহাই পেয়েছে।

যেদিন এ হুকুম হয়, পেভেল সেদিন অসুস্থতার দরুণ কারখানায় অনুপস্থিত; কাজেই সে কিছুই জানতে পারলো না। পরদিন শিজভ্‌ এবং মাখোটিন ব'লে দু'জন মজুর তার কাছে এসে হাজির হ'ল, বললো, সবাই আমাদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলো এই কথাটা জানতে যে, সত্যিই কি এমন কোনো আইন আছে যাতে ম্যানেজার কারখানার মশা তাড়াবার খরচা মজুরদের কাছ থেকে জুলুম ক'রে নিতে পারে। আছে এমন কোনো আইন? তিন বছরের কথা। সেবারও স্নানাগার তৈরি করার নাম ক'রে জোচ্চোররা এমনিভাবে ট্যাক্‌স্‌ বসিয়ে তিন হাজার আটশো রুবেল ঠকিয়ে নিয়েছিল। কোথায় এখন সে রুবেল, কোথায়-বা সে স্নানাগার!...

পেভেল তাদের বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলো যে, এ আইন নয়, অত্যাচার! এতে শুধু পকেট ভারি হ'বে কারখানার মালিকের।

মজুর দু'জন মুখ ভারি ক'রে চ'লে গেলো।

তারা চ'লে যেতে মা হাসিমুখে বললেন, বুড়োরাও তোর কাছে বুদ্ধি নিতে আসা শুরু করেছে, পেভেল।

পেভেল নিরুত্তরে কাগজ নিয়ে কি লিখতে বসলো। লেখা শেষ হ'লে মাকে বললো, এক্ষুণি শহরে গিয়ে এটা দিয়ে এসো।

বিপদ আছে কিছু? মা প্রশ্ন করলেন।

পেভেল বললো, হাঁ। শহরে আমাদের দলের যে কাগজ ছাপা হয় তার পরবর্তী সংখ্যায় এ 'কাদা-মাখা পেনি' গল্পটা বেরোনো চাই।

যাচ্ছি এক্ষুণি, ব'লে মা গায়ের কাপড়টা ঠিক ক'রে নিলেন। তাঁর যেন আনন্দ আর ধরে না। ছেলে এই প্রথম তাঁকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর ওপর জরুরী একটা কাজের ভার দিয়েছে। ছেলের কাজে তিনি লাগলেন এতদিনে।

শহরে গিয়ে তিনি কার্যসিদ্ধি ক'রে ফিরে এলেন।

তার পরের সোমবার—মাথা ধরেছে ব'লে পেভেল কারখানায় যায়নি। খেতে বসেছে, এমন সময় ফেদিয়া মেজিন ছু'টে এলো রুদ্ধশ্বাসে—তার মুখে উত্তেজনা এবং আনন্দ। বললো, এসো, কারখানা সুদ্ধ মজুর জেগে উঠেছে। তোমাকে ডাকতে পাঠালে তারা। শিজভ, মাখোটিন বলে, তোমার মতো ক'রে আর কেউ বোঝাতে পারবে না। ব্বাব্বা, কী কাণ্ড!

পেভেল নীরবে পোশাক পরতে লাগলো।

মেজিন বলতে লাগলো, মেয়েরা জড়ো হ'য়ে কী রকম চেঁচাচ্ছে দেখো।

মা বললেন, তুই অসুস্থ, ওরা কি করছে কে জানে। চল, আমিও যাচ্ছি।

পেভেল সংক্ষেপে বললো, চলো।

নীরবে দ্রুতপদে তারা কারখানায় এসে উপস্থিত হ'ল। দুয়ারের কাছে মেয়েরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠে আলোচনা চালিয়েছে। তাদের ঠেলে তিনজন কারখানার উঠানের ভেতরে এসে ঢুকলো। চারদিকে উত্তেজিত জনতার চীৎকার এবং আস্ফালন। শিজভ,

মাখোটিন, ভিয়ালভ এবং আরো পাঁচ ছ'জন পাণ্ডা একটা পুরানো লৌহস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে হাত দুলিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করছে ;—সবার চোখ তাদের দিকে। হঠাৎ কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পেভেল এসেছে।

পেভেল ? নিয়ে এসো।

তৎক্ষণাৎ পেভেলকে ধ'রে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মা একা পেছনে পড়ে রইলেন।

চারদিকে কেবল শব্দ হ'তে লাগলো, চুপ, চুপ ! অদূরে রাইবিনের গলা শোনা গেলো,···আমরা দাঁড়াব কোপকের জন্য নয়—ন্যায়ের জন্য। কোপেকের গায়ে যে অজচ্ছল রক্ত মাখানো, তার জন্য···

জনতার কানে বেশ জোরে গিয়ে এ কথাটা পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো উত্তেজনাপূর্ণ চীৎকার, সাবাস রাইবিন, ঠিক বলেছ।

আঃ, চুপ্ করনা।

পেভেল এসেছে।

সবগুলি কণ্ঠ একত্র মিলে সৃষ্টি হ'ল একটা তুমুল কোলাহল,—কলের শব্দ, বাষ্পের ফোঁসফোঁসানি, চামড়ার বেল্টের আওয়াজ, সব তাতে ডুবে গেলো। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসছে, হাত দোলাচ্ছে, তর্কাতর্কি করছে, তিক্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। যে বেদনা এতদিন বের হবার কোন পথ পায়নি, শ্রান্ত বুকে চাপা রয়েছে, আজ তা' জেগে উঠেছে, বের হতে চাচ্ছে, মুখ থেকে ফেটে পড়ছে বাক্যবাণে। আকাশে উঠছে বিরাট এক পাখীর মতো বিচিত্র পাখা দুলিয়ে, জনতাকে নখে জড়িয়ে টেনে-হিঁচড়ে, পরস্পর ঠোকাঠুকি ক'রে ;—রোষ-রক্তিম অগ্নিশিখার মতো জীবন নিয়ে উদ্দীপ্ত হ'য়ে

উঠেছে। জনতার মাথার উপর ধুলি এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী···সবার মুখে আগুন জ্বলছে, গাল বেয়ে পড়ছে ঘাম, কালো কালো ফোটায়—কালো মুখের মধ্য দিয়ে চোখ জ্বলছে, দাঁত চক্‌চক্ করছে।

শিজভ, মাখোটিন যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে উঠে দাঁড়ালো পেভেল, তার কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ল, কমরেড :

কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে পেভেলের মধ্যে জাগলো একটা অদম্য আত্মপ্রত্যয়, সংগ্রামেচ্ছা, জনতার কাছে হৃদয় খু'লে ধরার আগ্রহ।

'কমরেড'—কথাটা তাকে আনন্দে, শক্তিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো। 'আমরা মজুররা গির্জা এবং কারখানা গড়ে তুলি, শৃঙ্খল বানাই, মুদ্রা তৈরি করি, পুতুল গড়ি, কলকব্জা নির্মাণ করি···আমরা সেই জীবন্ত শক্তি, যা' আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দুনিয়াকে বাঁচিয়ে রাখে—আহার এবং আনন্দ জুগিয়ে। সর্বকালে, সর্বস্থানে, কাজ করার বেলায় আমরাই সবার প্রথমে কিন্তু জীবনের অধিকারে সেই আমরাই সর্বপশ্চাতে। কে কেয়ার করে আমাদের? কে আমাদের ভালো করতে চায়? কে আমাদের মানুষ ব'লে স্বীকার করে?—কেউ না।

জনতাও প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলো, কেউ না।

শান্ত, সংযত, গম্ভীর, সরল ভাষায় পেভেল বক্তৃতা দিতে লাগলো। জনতা ধীরে ধীরে তার কাছে ঘেঁষে এক কালো ঘন সহস্র-শির বপুর মতো হ'য়ে দাঁড়ালো, তাদের শত শত উৎসুক চোখ পেভেলের দিকে নিবদ্ধ। পেভেলের কথাগুলো যেন তারা নির্বাক আগ্রহে গিলছে। পেভেল বলতে লাগলো, শ্রেষ্ঠতর জীবন আমরা কিছুতেই লাভ করতে পারব না ততদিন—যতদিন না আমরা উপলব্ধি করি, আমরা কমরেড,

আমরা বন্ধু, এক অভিন্ন সংকল্পে পরস্পরে বাঁধা—সে সংকল্প কি জানো? —আমাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম।

মার কাছ থেকে কে একজন ব'লে উঠলো, কাজের কথা বলো।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে রব হ'ল, গোলমাল করো না, চুপ কর।

একজন মন্তব্য করলো, সোশিয়ালিস্ট, কিন্তু বোকা নয়।

আর একজন বললো, বেশ জোর গলায় বলছে কিন্তু।

তারপর আবার পেভেলের গলা,—'বন্ধুগণ, আজ দিন এসেছে, আমাদের শ্রমভোজী ঐ যে লোভী লক্ষপতির দল, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'বে, আমাদের আত্মরক্ষা করতে হ'বে, বুঝতে হ'বে, আমাদের রক্ষা করতে পারব একমাত্র আমরা, অপর কেউ নয়। শত্রুকে যদি ধ্বংস করতে হয় তবে একমাত্র নীতি গ্রহণ করতে হ'বে আমাদের—প্রত্যেকের জন্য সকলে, সকলের জন্য প্রত্যেকে।

মাখোটিন চীৎকার করে উঠলো, সাঁচ্চা কথা বলছে। শোন ভাই-সব, সত্য কথা শোনো।

পেভেল বললো, এক্ষুণি ম্যানেজারকে ডাকবো আমরা, ডেকে জিগ্যেস করব।

পলকে যেন ঘূর্ণিবাত্যায় আহত হ'য়ে জনতা দুলে উঠলো, অজস্র কণ্ঠে চীৎকার হ'ল, ম্যানেজার! ম্যানেজার! সে এসে জবাব দিক।

প্রতিনিধি পাঠাও।...তাকে এখানে হাজির কর।

বহু বাদ-বিতর্কের পর প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'ল শিজভ, রাইবিন এবং পেভেল। তারা যাত্রা করবে, হঠাৎ জনতার মধ্যে জেগে উঠলো একটা অনুচ্চ ধ্বনি, ম্যানেজার নিজেই আসছে।

জনতা দু'ফাঁক হ'য়ে পথ ক'রে দিলো, তার মধ্য দিয়ে ম্যানেজার

ঢুকলেন। হাত ঈষৎ দুলিয়ে, লোক সরিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছেন তিনি; কিন্তু কাউকে স্পর্শ করছেন না। লম্বা-চওড়া শরীর, কুঞ্চিত চোখ, শাসনকর্তাসুলভ তীক্ষ্ণ-সন্ধানী দৃষ্টি বিস্তার ক'রে তিনি মজুরদের মুখ দেখে নিচ্ছেন। মজুররা সসম্ভ্রমে টুপি খুলে হাতে নিচ্ছে, তিনি তাদের অভিবাদন যেন অগ্রাহ্য ক'রে চলে যাচ্ছেন। তার উপস্থিতিতে জনতা চুপ করে গেলো, ঘাবড়ে গেলো। সবার মুখে উদ্বেগের হাসি, কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি,—শিশু যেন তার ছেলেমির জন্য অনুতপ্ত। ম্যানেজার সেই লৌহস্তূপের ওপর পেভেল, শিজভের সামনে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ জনতার দিকে চেয়ে বললেন, এসব হল্লার মানে কি? কাজ ফেলে এসেছ কেন?

সব চুপ-চাপ। কয়েক সেকেণ্ড গেলো, কোন জবাব নেই। শিজভ্ মাথা নীচু করে দাঁড়ালো।

ম্যানেজার বললে, যা' জিগ্যেস করছি তার জবাব দাও।

পেভেল তার সামনে এগিয়ে গিয়ে শিজভ্, রাইবিনকে দেখিয়ে বললো, আমরা এই তিন জন শ্রমিক-বন্ধুদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছি, আপনাকে সেই কোপেক-ট্যাক্সটা রদ করতে বলার জন্য।

কেন? পেভেলের দিকে না চেয়ে ম্যানেজার প্রশ্ন করলো।

পেভেল বেশ জোরের সঙ্গেই বললো, এরকম ট্যাক্স আমরা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করিনা।

ওঃ, তাহলে আমার জলা সাফ করবার প্রস্তাবটায় তুমি দেখতে পাচ্ছ শুধুই মজুরদের শোষণ করবার ফন্দি,—তাদের মঙ্গলেচ্ছা নয়। এই তো?

হাঁ।

আর, তুমি?—ম্যানেজার রাইবিনকে জিগ্যেস করলেন।

আমারো ঐ একই কথা।

শিজভকে প্রশ্ন করতে সেও ঐ জবাব দিলো।

ম্যানেজার ধীরে ধীরে জনতার দিকে চেয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পেভেলকে বিদ্ধ করে বললেন, তোমাকে দেখে বেশ চোখা লোক মালুম হচ্ছে। তুমি কি প্লানটার উপকারিতা বুঝতে পাচ্ছ না?

পেভেল জোর গলায় বললো, আমরা বুঝতুম, কারখানার নিজের খরচে যদি জলা সাফ করা হ'ত।

ম্যানেজার রুক্ষ জবাবে বললে, কারখানাটা দাতব্যাগার নয়। আমার হুকুম, এক্ষুণি—এই মুহূর্তে কাজে যাও। এই ব'লে কারও দিকে দৃকপাত না ক'রে ম্যানেজার নীচে নাবতে গেলেন।—জনতার মধ্য থেকে একটা অসন্তুষ্টির চাপা গুঞ্জন শুনে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললেন, কী!

সব চুপ চাপ। দূর থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এলো, তুমি নিজে কাজ করগে।

ম্যানেজার স্পষ্ট ভাষায় বেশ একটু কড়া সুরে বললো, পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি কাজ শুরু না কর তাহ'লে তোমাদের প্রত্যেককে বরখাস্ত করা হবে। এই বলে তিনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোরগোল উঠলো।

ওঁকে বলোনা।

ন্যায়বিচার চাইতে গিয়ে এই পেলুম···এতো দেখছি ফ্যাসাদ আরও বাড়লো।

পেভেলের দিকে চেয়ে একজন চেঁচিয়ে বললো, কি হে মাতব্বর উকিল, এখন কি হবে? খুব তো বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিচ্ছিলে, কিন্তু যেই ম্যানেজার এলো, অমনি সব ফাঁকা।

তাইতো, কি করা যায় এখন ?

গোলমাল এমনি করে বেড়ে উঠতে পেভেল হাত তুলে বললো, বন্ধুগণ, আমি প্রস্তাব করি যে, কোপেক-ট্যাক্স্ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট করে থাকি।

জবাবে শোনা গেল উত্তেজিত কণ্ঠ-কোলাহল, আমাদের বোকা পেয়েছ আর কি !

আমাদের এই করা উচিত।

ধর্মঘট ?

এক কোপেকের জন্য ?

না কেন ? কেন ধর্মঘট করব না ?

আমাদের দল সুদ্ধু র কাজ যাবে !

তা'হলে কাজ করবে কে ?

নতুন লোকের অভাব কি।

কারা ? যুডাসেরা ?

ফি বছর মশা তাড়াবার জন্যে আমাদের ত তিন রুবেল ষাট কোপেক খরচ করতেই হয়।

সবাইকেই তা' দিতে হবে।

পেভেল নেবে গিয়ে মার পাশটিতে দাঁড়ালো। রাইবিন তার কাছে এসে বললো, ওদের দিয়ে ধর্মঘট করাতে পারবে না। একটা পেনির ওপরও ওদের লোভ দুরন্ত, অত্যন্ত ভীতু ওরা; বড় জোর তিন'শকে তুমি দলে টানতে পারো, আর নয়। একগাদা গোবর কি একটা শলা· দিয়ে তোলা যায় ?

পেভেল চুপ ক'রে রইলো, মজুররা সব পেভেলের বাগ্মীতার প্রশংসা

করলো কিন্তু ধর্মঘটের সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে কাজে গিয়ে যোগ দিলো। পেভেল মনমরা হ'য়ে পড়লো, তার মাথা ঘুরছে···আত্ম-শক্তিতে আর তার বিশ্বাস নেই। ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরে এলো।

সেইদিন রাত্রেই পেভেল গ্রেপ্তার হ'ল।

—নয়—

ছেলেকে হারিয়ে মা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন,—তাঁর প্রাণ কেবলই হা-হা ক'রে বলতে লাগলো, আমায়ও কেন পেভেলের সঙ্গে ধ'রে নিয়ে গেলো না। রাইবিন এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আমার বাড়িতেও তারা হানা দিয়েছিল, কিন্তু ধরলো না—ধরলো পেভেলকে। ওদের এই-ই হাল। ম্যানেজার চোখ ইসারা করলো, পুলিস বল্লো, 'যো হুকুম'··· আর দেখতে দেখতে একটা লোক অদৃশ্য হ'ল। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। একজন পকেট মারে, আর একজন পরাণে মারে।

মা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের উচিত পেভেলের পক্ষ হ'য়ে লড়া—তোমাদের সকলের জন্যই সে আজ জেলে গেছে!

কার উচিত?

তোমাদের সবার।

রাইবিন কেমন এক শ্লেষের হাসি হেসে বললো, তোমার যে অতিরিক্ত দাবি, মা। কেউ ওর কিছুই করবে না। কর্তারা হাজার হাজার বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। আমাদের কলজের মধ্যে তারা বহুত পেরেক ঠুকে রেখেছেন···আমাদের মধ্যে ব্যবধানের বিরাট

দেয়াল। আমরা ইচ্ছে করলেই এক্ষুণি তা' সরিয়ে ফেলতে পারিনে…
এইগুলো বাধা দিচ্ছে…এগুলোকে আগে দূর করা চাই।

রাইবিন চ'লে গেলো।

রাত্রে শোময়লোভ এবং য়েগর আইভানোভিচ্ এসে হাজির হ'লো।
আইভানোভিচ বল্‌লো, নিকোলাই জেল থেকে বেরিয়েছে, জানো
দিদিমা ?

তাই নাকি ? ক'মাস জেলে ছিল সে ?

পাঁচ মাস এগারো দিন। এণ্ড্রি আর পেভেলের সঙ্গে তার দেখা
হয়েছে। এণ্ড্রি তোমায় প্রণাম জানিয়েছে আর পেভেল ব'লে
পাঠিয়েছে, ভয় নেই। জেল তো যাত্রা-পথের সরাই—যা প্রতিষ্ঠা এবং
তদ্বির করেছেন কর্তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।…এখন কাজের কথা
হ'ক, দিদিমা। কাল ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছে জানো ?

না। আরো কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে নাকি ?

হাঁ, চল্লিশ জন এবং আরো দশজনের হ'বার সম্ভাবনা। তার মধ্যে
একজন ইনি—শোময়লোভ।

মা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন, পেভেল—পেভেল তা'হলে একা
নেই। বললেন, এতগুলি লোক যখন ধরেছে তখন বেশিদিন রাখতে
পারবে না।

আইভানোভিচ বললো, সে কথা ঠিক, দিদিমা। আর আমরা
যদি ওদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারি, তা'হলে ওরা আরো নাকাল
হয়। কথাটা কি জানো, দিদিমা, ওরা গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
নিষিদ্ধ ইস্তাহারগুলোও যদি কারখানায় আর না ঢোকে তবে কর্তারা
নির্ঘাত বুঝবেন এসবের পাণ্ডা কারা। পেভেল আর তার সঙ্গীদের তখন

জেলে শক্ত ক'রে চেপে ধরবে। কাজেই যেমন ব্রতের খাতিরে তেমনি পেভেলদের জন্য আমাদের কারখানার ভেতরে ইস্তাহার বিলির কাজ ঠিক আগের মতোই চালানো চাই। খুব ভালো ইস্তাহারও হাতে আছে, কিন্তু সমস্যা, তা' কারখানায় ঢোকানো যায় কি ক'রে? কারখানার গেটে আজকাল প্রত্যেকের শরীর তল্লাশী করা হয়।

মা বুঝলেন, তাঁকে দিয়ে একটা-কিছু কাজ করাতে চায় ওরা। ছেলের মঙ্গলের জন্য কোন-কিছুই করতে তাঁর আপত্তি নেই; কাজেই বললেন, তা' কি করতে হ'বে আমাকে?

ফেরিওয়ালী মেরি নিলোভ্‌নাকে দিয়ে ইস্তাহারগুলো ঢোকাতে পারো না?

মা ব'লে উঠলেন, ওকে দিয়ে? সর্বনাশ, তা' হ'লে দুনিয়ার কারো জানতে আর বাকি থাকবে না।

তারপর একটু ভেবে বললেন, আমার কাছে রেখে যেয়ো, আমি নিজেই ব্যবস্থা করব। মেরির সাহায্যকারিণী সেজে কারখানায় খাবার নিয়ে যাবো, তখন···ধরা পড়ব না···সবাই দেখবে পেভেল জেলে গেছে বটে, কিন্তু জেল থেকেও তার হাত কাজ ক'রে যাচ্ছে।

তিনজনের মুখই আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। আইভানোভিচ বলে উঠলো, চমৎকার! শোময়লোভ বললো, এ যদি হয় তো জেল হ'বে আমার কাছে আরামকেদারা! মা ভাবলেন, ইস্তাহার বেরোলে কর্তারা একথা কবুল করতে বাধ্য হবেন, ইস্তাহার বিলির জন্য পেভেল দোষী নয়। সাফল্যের আশায় এবং আনন্দে মা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন, বললেন পেভেলকে বোলো, তার জন্য আমি না করতে পারি হেন কাজ নেই।

আইভানোভিচ মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি পেভেলের জন্য মিছে ভেবোনা, মা। জেল আমাদের কাছে বিশ্রাম এবং পাঠের স্থান—মুক্ত অবস্থায় যার ফুরসুৎ আমাদের মেলেনা। যাক, তা'হলে ইস্তাহার গুলো পাঠাবো। কাল থেকে আবার যুগান্ত-সঞ্চিত অন্ধকার-নাশী চাকা আগের মতো ঘুরতে আরম্ভ করবে। দীর্ঘজীবী হ'ক আমাদের স্বাধীনতা, আর দীর্ঘজীবী হ'ক এই মাতৃ-হৃদয়!

তারপর তারা বিদায় নিয়ে চলে গেলো! মা একান্ত মনে ভগবানকে ডাকেন আর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁর মানসপটে পেভেলের সঙ্গে আর সকলকার ছবি ফুটে ওঠে।

মা মেরির কাছে গিয়ে তার সাহায্যকারিণীর কাজ নিলেন।

—দশ—

পরদিন মজুররা অবাক্ হ'য়ে দেখলো, কারখানায় নতুন এক খাবারওয়ালী—পেভেলের মা।

মেরি নিজে বাজারে গিয়ে মাকে কারখানায় পাঠিয়েছে।

মজুররা দলে দলে মার কাছে এসে দাঁড়ায়। কেউ দেয় আশা, কেউ সান্ত্বনা, কেউ বা সহানুভূতি, কেউ-বা ম্যানেজার এবং পুলিসকে দেয় গাল। কেউ আবার বলে, আমি হলে তোমার ছেলের ফাঁসি দিতুম, লোকগুলোকে যাতে সে আর বিগড়াতে না পারে।

মা শিউরে উঠেন।

কারখানায় সে কী উত্তেজনা! স্থানে স্থানে মজুরদের ছোট ছোট দল, সবাই ঘোঁট পাকায়। চাপা গলায়···অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে। মাঝে মাঝে ফোরম্যানরা মাথা গলিয়ে দেখে যায়, তারা চলে যেতেই ওঠে ক্রুদ্ধ গালাগালি, হাসির হর্‌রা।

মার পাশ দিয়ে শোময়লোভকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় দুটো পুলিস। পিছু-পিছু শ'খানেক মজুরের হল্লা। পুলিসদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ এবং কটূক্তি বর্ষণ করতে করতে তারা চলেছে। একজন বললো, বা কমরেড, বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি!

আর একজন বলে উঠলো, নয়তো কি! আমাদের ওরা কম সম্মান ক'রে চলে?

তৃতীয় একজন বললো, হাঁ, বেড়াতে বেরোলেই সঙ্গে সঙ্গে বডিগার্ড চাইতো!

তীব্র তিক্ত স্বরে একচক্ষু জনৈক মজুর বললো, কি করবে! চোর-ডাকাত ধরে তো আর মজুরি পোষায় না, তাই নিরীহ লোকদের নিয়ে টানাটানি।

পেছন থেকে আর একজন বলে উঠলো, তাও আবার রাত্তিরে নয়, একবারে খোলা-মেলা দিনে-দুপুরে। লজ্জাও নেই হতভাগাদের। পুলিসেরা এই কটূক্তি এড়াতেই যেন দ্রুত পা চালিয়ে দেয় মজুরদের কথা যে কানে যাচ্ছে এমনই মনে হয়না।

শোময়লোভ হাসি-মুখে জেলে গেল। মার মনে হল, যেন তার আর একটি ছেলেকে কে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। এই যে হাসিমুখে জেলে যাওয়া, এর মাঝেও পেভেলেরই প্রভাব।

সমস্ত দিন পরে মা বাড়ি ফিরে এলেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে

এলো। মা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলেন, আইভানোভিচ কখন আসে ইস্তাহার নিয়ে।

হঠাৎ একসময়ে দ্বারে মৃদু করাঘাত হ'ল। মা দ্রুতগতিতে দোর খুলে দিয়ে দেখেন শশেংকা,—দেখেই মার মনে হ'ল, শশেংকা যেন অস্বাভাবিক রকমের মোটা হ'য়ে পড়েছে। বললেন, এতোদিন এদিক মাড়াওনি যে, ব্যাপার কি ?

শশেংকা হেসে বললো, জেলে ছিলুম যে, মা···পোশাকটা বদলাতে হ'বে আইভানোভিচ আসার আগে।

তাইতো, একেবারে নেয়ে উঠেছ যে।

ইস্তাহাবগুলো এনেছি।

দাও, আমার কাছে দাও,—মা অধীর আগ্রহে ব'লে উঠলেন।

দিচ্ছি—ব'লে শশেংকা গায়ের চাদরটা খুলে ঝাড়া দিলো, আর মায়ের সামনে পাতা-ঝরার মতো পড়তে লাগলো ভুঁয়ে একরাশি পাতলা কাগজের পার্শেল। মা হেসে তা' কুড়িয়ে নিলেন, বললেন, তাইতো অবাক্ হচ্ছিলুম, এতো মোটা হ'লে কি ক'রে! বড় কম তো আনোনি ? এসেছ কি ক'রে—হেঁটে ?

হাঁ।

মা চেয়ে দেখলেন, সেই অস্বাভাবিক মোটা মেয়েটি আবার আগের মতো অসামান্য সুন্দরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চোখের নীচে কালি। বললেন, এতদিন জেলে ছিলে মা, এবার কোথায় তুমি একটু বিশ্রাম নেবে, না, সাত মাইল এই মোট ব'য়ে নিয়ে এসেছো।

এ তো করতেই হ'বে, মা।

সে যাক—পেভেলের কথা বল। সে ঠিক আছে তো? ভয় খায়নি তো?

না, মা ! সে বিগড়াবে না, এটা ধ্রুব সত্য ব'লে ধরে নিতে পারো।

শশেংকা ধীরে ধীরে বললো, কী শক্তিমান পুরুষ এই পেভেল !

মা বললেন, সে ঠিক। অসুস্থ সে কখনো হয়নি।···কিন্তু তুমি যে শীতে কাঁপছ, দাঁড়াও, চা আর জ্যাম এনে দিচ্ছি।

মৃদুহাস্যে শশেংকা বললো, তোফা কিন্তু মা এত রাতে তোমার কিছু করবার দরকার নেই, আমি নিজ হাতেই করছি।

হ্যাঁ, তা বৈকি। এই রোগা ক্লান্ত শরীর নিয়ে—নয় ? তিরস্কারের সুরে এই কথা ব'লে মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। শশেংকাও গেলো তাঁর পিছু-পিছু। মা চা করছেন, আর সে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়ে বললো, হাঁ, মা, সত্যিই আমি বড়ো ক্লান্ত। জেলখানা মানুষকে নির্জীব ক'রে দেয়। এই বাধ্যতামূলক কর্মহীনতাই হচ্ছে সেখানকার সব চেয়ে ভয়ের কথা। এর চেয়ে পীড়াদায়ক আর কিছু নেই। এক হপ্তা থাকি, পাঁচ হপ্তা থাকি—বাইরে কতো কাজ করার আছে তাতো জানি। জানি যে, মানুষ আজও জ্ঞানের জন্য বুভুক্ষিত—আমরা তাদের অভাব পূর্ণ করতে সক্ষম কিন্তু কি করব, পশুর মতো বন্দী আমরা। এইটেই অসহ্য বোধ হয়—প্রাণ যেন শুকিয়ে যায়।

মা বললেন, কিন্তু এর জন্য কে তোমাদের পুরস্কৃত করবে ?··· তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনিই তার জবাব দিলেন, ভগবান।—কিন্তু তাকে তো তোমরা বিশ্বাস করনা।

না—শশেংকা সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বললো।

নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের মর্ম্ম বুঝলে না তোমরা! ভগবানকে হারিয়ে জীবনের এপথে কেমন ক'রে চলবে তোমরা ?···

বাইরে জোর পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মা চমকে

উঠলেন। শশেংকা উঠে দাঁড়ালো। ফিস্‌ফাস্ করে বললো, দোর খুলো না। পুলিস যদি হয় বলবে আমাকে চেনোনা—আমি ভুলে এ বাড়িতে এসে পড়েছি। হঠাৎ মূর্ছা গেছি…তুমি পোশাক ছাড়াতে গিয়ে দেখেছ ইস্তাহার…বুঝলে?

কেন? কিসের জন্য?

চুপ। এতো পুলিস নয়, মনে হচ্ছে, আইভানোভিচ্।

সত্যই আইভানোভিচ্ এসে ঘরে ঢুকলো। শশেংকাকে দেখে বললো, এরি মধ্যে এসে গেছ তুমি!

মার দিকে ফিরে বললো, তোমার এ মেয়েটি দিদিমা পুলিসের গায়ের কাঁটা। জেল-পরিদর্শক কি একটা অপমান করায় পণ করে বসলো, ক্ষমা না চাইলে অনশন করে মরবে। আটদিন পর্যন্ত কিছু খেলো না,—মরে আর কি!

মা অবাক হয়ে বললেন, বলো কি! পারলে পরপর আটদিন না খেয়ে থাকতে?

শশেংকা তাচ্ছিল্যভরে ঘাড় দুলিয়ে বললো, কি করব। তাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে হবে তো!

যদি মারা যেতে?

যেতুম—গত্যন্তর ছিল না কিন্তু শেষটা সে বাধ্য হয়েছিল ক্ষমা চাইতে। অপমান কখনো ক্ষমা করতে নেই, মা!

মা ধীরে ধীরে বললেন, হাঁ, অথচ আমরা স্ত্রীলোকেরা জীবনভোর অপমান সয়ে আসছি।…

চা পান করে শশেংকা শহরে যাবে বলে উঠে পড়লো। এত রাত্তিরে একা কি করে যাবে ভেবে শঙ্কিত হয়ে মা তাকে থাকতে বললেন;

কিন্তু সে শুনলো না। শহরে তাকে ফিরতেই হবে। আইভানোভিচের কাজ আছে বলে সেও সঙ্গে যেতে পারলো না। মা শশেংকার জন্য দুঃখ করতে লাগলেন। আইভানোভিচ্ বললো, জমিদারের আদুরে মেয়ে···ওর সইবে কেন? জেলে গিয়ে ওর দেহ ভেঙে পড়েছে।···জানো দিদিমা, ওরা দু'টিতে বিয়ে করতে চায়।

কারা?

ও আর পেভেল। কিন্তু এতোদিন ও পেরে উঠেনি। ইনি যখন জেলে উনি তখন বাইরে। উনি যখন জেলে ইনি তখন বাইরে।

মা বললেন, জানিনে তো! কেমন করে জানবো? পেভেল আমার কাছে তো কিছু বলে নি।

শশেংকার জন্য মার বুকটা যেন আরো দরদে ভরে উঠলো।

আইভানোভিচ্ বললো, তুমি শশেংকার জন্য দুঃখ করছ দিদিমা, কিন্তু করে কি হবে? আমাদের বিদ্রোহীদের সবার জন্য যদি তোমার চোখের জল ফেলতে হয় তো চোখের জলও তো অতো পাবে না—অশ্রু-উৎস শুকিয়ে যাবে তোমার। স্বীকার করি জীবন আমাদের কাছে মোটেই সহজ নয়। আমার এক বন্ধুর কথাই বলি—এই দিনকয়েক আগে তিনি নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি যখন নোভোগারদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন স্ত্রী স্মোলেন্স্কে তাঁর প্রতীক্ষা করছেন। তিনি যখন স্মোলেন্স্কে পৌঁছলেন তখন তাঁর স্ত্রী মস্কোর কারাগারে। এবার স্ত্রীর সাইবেরিয়া যাওয়ার পালা। বিদ্রোহ এবং বিবাহ—এদুটো পরস্পর-বিরোধী এবং অসুবিধাজনক জিনিস—স্বামীর পক্ষেও অসুবিধা, স্ত্রীর পক্ষেও অসুবিধা, কাজের পক্ষেও অসুবিধা। আমারও একজন স্ত্রী ছিল,

দিদিমা, কিন্তু এমনিধারা জীবন পাঁচ বছরের মধ্যেই তাকে কবরশায়ী করেছে···

এক চুমুকে চায়ের কাপ নিঃশেষ ক'রে সে তার দীর্ঘ কারা-জীবন এবং নির্বাসনকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলো।

মা নিঃশব্দে সব শুনলেন। তারপর ন্যস্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

—এগারো—

পরদিন দুপুরে আবার খাবার নিয়ে মা কারখানার দুয়ারে এসে হাজির হলেন। আজ ভারি কড়া পাহারা। জামার পকেট থেকে শুরু ক'রে মাথার চুল পর্যন্ত খুঁজে তবে এক-একজন লোককে ঢুকতে দেওয়া হয়। মা এগিয়ে বললেন, একবারটি ঢুকতে দাওনা, বাবা! বড্ড ভারি, আর বইতে পারিনে, পিঠ দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

যা যা বুড়ি, ভেতরে যা···দেখোনা, উনিও আসেন যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে!

মা ঢুকে পড়লেন। তারপর যথাস্থানে খাবারের পাত্র দুটো নাবিয়ে রেখে ঘাম মুছে ফেলে চারদিকে চাইলেন। গুসেভ ভ্রাতৃদ্বয় কারখানার কামারের কাজ করে—তারা তৎক্ষণাৎ কাছে এসে দাঁড়ালো। বড়ো ভাই ভ্যাসিলি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করলো, পিরগ পেলে?

হাঁ, কাল আনবো।

এই ছিল নির্ধারিত গুপ্ত-সংকেত। দু'ভায়ের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে

উঠলো। আইভান হৃদয়াবেগ কিছুতেই সামাল করতে পারলো না, ব'লে উঠলো, ওঃ, এমন মা আর হয় না!

ভ্যাসিলি মাটিতে আসন ক'রে বসে খাবারের পাত্রটার দিকে ঝুঁ'কে পড়লো, আর অমনি এক বাণ্ডিল ইস্তাহার এসে তার বুকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। পরক্ষণেই তা' তার জুতোর মধ্যে পায়ের তলায় চ'লে গেলো।

এমন চটপট কাজটা হ'য়ে গেলো যে অন্য কেউ তা' একদম লক্ষ্য করতে পারলো না। ভ্যাসিলিও তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য বাজে কথা বলছে, বাড়িতে না গিয়ে আজো এসো এইখানে, এই বুড়িমার কাছ থেকে খাবার খাই।

মা ক্রমাগত হাঁকেন, চাই টক্ কপির সুপ, গরম ঝোল, রোস্ট, মাংস, আর এক-এক ক'রে ইস্তাহারের বাণ্ডিলগুলো আইভান ভ্যাসিলির কাছে চালান দেন। মজুরদল কাছে এসে পড়াতে মা ইস্তাহার দেওয়া থামিয়ে দিয়ে খাবারের হাঁক হাঁকতে লাগলেন। মজুররা এলো, খাবার খেলো, চলে গেলো। তারপর মা আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন এবং শেষ করলেন।

সাফল্যের আবেগে আনন্দে তাঁর সমস্ত দিনটা এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যে কাটলো।

রাত্রে এণ্ড্রি এসে হাজির হ'ল। সে কারামুক্ত হ'য়ে এসেছে অথচ পেভেল কোথায়?—মা এণ্ড্রির বুকে মুখ লুকিয়ে ছোটো মেয়েটির মতো কাঁদতে লাগলেন। এণ্ড্রি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কেঁদোনা, মা, পেভেলের জন্য কোন ভাবনা নেই, সে ভোফা আছে। শীগ্‌গিরই জেল থেকে সে ফিরে আসবে।

এণ্ড্রি মার কাছে সবিস্তারে জেলের দৈনিক জীবনযাত্রাকাহিনী বর্ণনা করে যায়। মা একটু আশ্বস্ত হন, তারপর বলেন; আজ কি করেছি জানো?…

কি?

মা ইস্তাহার-বিলির কাহিনী বলেন। এণ্ড্রি উল্লসিত হ'য়ে বললো, চমৎকার, মা! এতে যে আমাদের কাজ কতটা এগিয়ে গেলো, কতো সুবিধা হ'ল, তা' বোধ করি তুমি নিজেও বোঝোনি!

মায়ের প্রাণ…একটুকুতেই খুলে যায় স্নেহাকাঙ্ক্ষী সন্তানের কাছে। এণ্ড্রির কাছেও মা তাঁর করুণ জীবনকাহিনী বিবৃত করে বলেন: স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলের মুখ চেয়ে রইলুম! সেই ছেলে যখন বাপের মতো বিপথে পা দিলো, তখন কত যে ব্যথা পেলুম প্রাণে, তা' তোমায় কেমন ক'রে বোঝাবো, এণ্ড্রি? জানি, আমার এ ভালোবাসা স্বার্থ-দুষ্ট, সংকীর্ণ—তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমন পরের জন্য দুঃখ বরণ করে নাও, আমি তো তা পারিনে! আমি আমার নিকট-আত্মীয়দের ভালোবাসি, পেভেলকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি—বোধহয় পেভেলের চাইতেও বেশি……পেভেল বড় চাপা…আমাকে কিছু বলে না। শশেংকাকে বিয়ে করতে চায়—আমি মা, আমাকে একথাটাও জানালোনা।

এণ্ড্রি বললো, এ সত্যি নয় মা,—আমি জানি এ সত্যি নয়! পেভেল শশেংকাকে ভালোবাসে একথা ঠিক, কিন্তু বিয়ে করতে চায় না, বিয়ে করতে পারেনা, বিয়ে করবেনা।…

বিষণ্ণ চোখে মা বললেন, হাঁরে, এমনি ক'রে কি তোরা নিজেদের বলি দিবি?

এণ্ড্রি নিজের মনেই ব'লে চ'লে, পেভেল অসাধারণ মানুষ—লোহার মতো শক্ত তার মন।

মা চিন্তাকুল কণ্ঠে বলেন, কিন্তু সে আজ বন্দী। মন প্রবোধ মানে না।...যদিও জানি সোনার ছেলে তোমরা, মানুষের হিতের জন্য এই কঠোর জীবন বরণ ক'রে নিয়েছো, সত্যের জন্য এই জীবন-ভর দুঃখকে স্বীকার করেছো। কি সে সত্য তাও আমি জানি—ধনী যতদিন থাকবে দুনিয়ায়, মানুষ কিছু পাবে না—সত্যও না, সুখও না। এ সাচ্চা কথা, এণ্ড্রি।

এণ্ড্রি ধীরে ধীরে বলে, ঠিক কথা, মা। কার্চে একজন ইহুদী কবি ছিলেন। একবার তিনি লিখলেন—

বিনা দোষে যারা ফাঁসি কাঠে দিল প্রাণ,
সত্য তাদের করিবে জীবন দান।

ঘটনাচক্রে কার্চের পুলিসের হাতেই তিনি খুন হলেন। হু'ন, কথা তা' নয়। কথা হলো, তিনি সত্য কি তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা' প্রচার করার জন্য অনেক-কিছু করেছিলেন, তিনি সত্য ব্যক্ত করেছিলেন।

এমনি ক'রে সে রাতটা কাটলো।

—বারো—

পরদিন কারখানার গেটে যেতেই রক্ষীরা বেশ রুক্ষভাবে মাল মাটিতে নাবিয়ে মাকে ভালো করে পরীক্ষা করলো।

মা বললেন, আমার খাবার জুড়িয়ে যাবে, বাবা!

চোপ রও—একজন রক্ষী বললো।

আর একজন বললো, ইস্তাহারগুলো নিশ্চয়ই বেড়ার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

মা রেহাই পেলেন।

বুড়ো শিজভ্ এসে বললো চাপা গলায়, শুনেছো তো, মা?

কি?

ইস্তাহারগুলো আবার দেখা দিয়েছে। রুটির ওপর চিনির মতো ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ওরা। অথচ শাস্তি হ'ল এর জন্য আমার ভাইপোর, তোমার ছেলের। এখন পরিষ্কার দেখা গেলো, ওরা নিরপরাধ।

তারপর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, বাবা, এ মানুষ নয় যে হুমকি দিয়ে দমিয়ে রাখবে। এ ভাবধারা—একে পোকার মতো টিপে মারা চলেনা।

মা খাবার হাঁকতে লাগলেন। কারখানায় সেদিন সে কী উত্তেজনা! মজুররা আলাপ-আলোচনা আনন্দে উতলা। একজন বলছে, বাছাধনরা সত্য কথা সইতে পারেন না।

কর্তারা ক্রুদ্ধ বিব্রত হ'য়ে ছুটাছুটি করছেন। একজন বলছেন, ব্যাটারা হাসছে দেখো। হাসবার মতো বিষয় কিনা—ম্যানেজার যা' বলেন ঠিক—আমূল ধ্বংস করতে চায় ওরা। ব্যাটাদের শুধু আগাছার মতো ওপড়ালে হবে না, একেবারে চষে একশা করে দিতে হ'বে।

আর এক কর্তা বীর দর্পে অদৃশ্য দুশমনের উদ্দেশে আস্ফালন করে বলে, যা' খুশি ছাপা, ব্যাটা বজ্জাত, কিন্তু খবর্দার আমার বিরুদ্ধে একটা কথা বলেছিস কি মরেছিস।

মা

গুসেভ এসে মাকে বললো, আজ আবার তোমার কাছে খেতে এসেছি, মা। ওঃ যা খাবার তুমি দিয়েছ, মা, চমৎকার, অতি চমৎকার!

মা খুশি হলেন, ভাবলেন, আমাকে না হ'লে এদের চলবে কি করে?

অদূরে একজন মজুর বলছে, আমি পেলুম না একখানা কোথাও।

আর একজন বলছে, শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। পড়তে না পারলেও এটা বুঝি, বাছাধনদের আঁতে বেশ একটু ঘা লেগেছে।

তৃতীয়জন বল্‌লো, বয়লার ঘরে চলো, পড়ে শোনাচ্ছি।

গুসেভ ইঙ্গিত ক'রে বল্‌লো, দেখছ না, মা, কেমন কাজ করছে?

মা খুশি হ'য়ে বাড়ি ফিরে এলেন। এণ্ড্রিকে বলেন, ওরা দুঃখ করছিল পড়তে জানেনা ব'লে। আমিও তো তাই—সেই ছোটবেলা যতটুকু যা' শিখেছিলুম, স্রেফ ভুলে ব'সে আছি।

আবার শেখো, মা।

মরতে বসেছি, এখন শেখবো? ঠাট্টা করিসনি, বাছা!

এণ্ড্রি কিন্তু শেল্‌ফ থেকে একটা বই নিয়ে মাকে বর্ণ-পরিচয় করাতে লেগে গেলো। ছুরির ডগা দিয়ে একটা অক্ষর দেখিয়ে বললো, এটি কি?

আর।

এটা?

এ।

এম্‌নিভাবে মার শিক্ষা শুরু হয়।

পড়তে পড়তে এক সময় মা হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন, এক পা যখন কবরে, তখন বসলুম বই নিয়ে।

এণ্ড্রি সান্ত্বনা দিয়ে বললো, কেঁদোনা, মা, তোমার দোষ কি? জীবন তো আর তুমি ইচ্ছে ক'রে অমন ভাবে কাটাও নি। তুমি তবু বুঝতে

পাচ্ছ, কী শোচনীয় জীবন তোমাদের। অনেকে কিন্তু এই কথাটাই বুঝতে পারেনা। হাজার হাজার লোক গরু-বাছুরের মতো বেঁচে থেকে বড়াই করে, তোফা আছি। কিন্তু কোথায় তোফা তাদের জীবন! আজ কাজ শেষ হলে খাওয়া, কালও কাজ শেষ হ'লে খাওয়া, পরশুও তাই—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর…ঐ একই রুটিন…কাজ আর খাওয়া, কাজ আর খাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চার দল আমদানি, দু'দিন তাদের নিয়ে আমোদ…তারপরে রুটিতে টান পড়লে তাদেরই ওপর রাগের ঝাল ঝাড়া, 'খালি গোগ্রাসে গেলা, বড়োও হয় না যে, কাজ ক'রে একটু সাহায্য করবে।' ছেলেমেয়েদের তারা ভারবাহী পশু করে তোলে। ছেলেমেয়েরা পেটের জন্য খাটে, জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলে একটা চুরি-করা পচা ঝাড়নের মতো। প্রাণ তাদের চঞ্চল হয়ে ওঠেনা আনন্দের সাড়ায়, কখনো দ্রুত তালে বেজে ওঠেনা হৃদয়দ্রাবী ভাবের আবেগে। কেউ বাঁচে ফকিরের মতো ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রে, কেউ জীবন কাটায় চোরের মতো পরের জিনিস নিয়ে। কর্তারা চোরের আইন তৈরি করেছে, লাঠি-ধারী রক্ষীদল মোতায়েন করে তাদের বলছে, 'আমাদের তৈরি আইন রক্ষা কর! ভারি সুবিধার আইন এগুলো—জনসাধারণের রক্ত শুষে নেওয়ার অধিকার আমাদের দিয়েছে।' বাইরে থেকে মানুষকে চেপে পিষে নিঙরে নিতে চায় ওরা, কিন্তু মানুষ বাধা দেয়। তাই ভেতরে এই আইন চালানো—যুক্তি-শক্তিও যাতে তাদের লোপ-পেয়ে যায়। মানুষ একমাত্র তারাই যারা মানুষের দেহের শৃঙ্খল নষ্ট করে, মানুষের মনের শৃঙ্খল অপসারিত করে। তুমিওতো তাই করতে চলেছো, মা—তোমার সাধ্যমত।

মা

আমি! আমি কী করতে পারব, এণ্ড্রি!

কি করতে পারবে না, মা? কেন পারবে না? বর্ষা-ধারার মতো আমাদের কাজ—এর প্রত্যেকটি ফোঁটা পরিস্ফুট করে বীজকে। যখন তুমি পড়তে শিখবে, মা, তখন···হাঁ, তোমায় শিখতেই হবে···ভাবো দেখি, পেভেল ফিরে এসে কতটা অবাক্ হবে!

মা মনোযোগী ছাত্রীর মতো বই নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন।

তেরো

দরজায় শব্দ হতে মা খুলে দিয়ে দেখেন রাইবিন।

রাইবিন বললো, তুমি একা, মা?

হাঁ।

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমার একটা থিওরী আছে।

মা উদ্বেগে, আশঙ্কায়, রাইবিন কি যেন বলে ভেবে তার দিকে চাইলেন।

রাইবিন বললো, সব-কিছুর মূলে চাই টাকা। এই ইস্তাহারগুলোর টাকা জোগায় কে?

মা বললেন, জানিনে তো!

রাইবিন বললো, তারপর, দ্বিতীয় জিগ্যাস্য, এসব লেখে কারা? শিক্ষিত লোকেরা, কর্তারা। কর্তারা এই সব বই লিখে ছড়ায়—এবং এই বইয়েতে তাদেরই বিরুদ্ধে কথা থাকে। এখন আমায় বল, মা, কেন,

কোন্ স্বার্থে কর্তারা তাদের অর্থ এবং সময় ব্যয় করে, তাদের নিজেদের, বিরুদ্ধেই লোক ক্ষেপিয়ে তোলে?

মা ভীত হ'য়ে বলেন, তোমার কি মত?

রাইবিন বলে, আমার মত! যখন ঠিক পেলুম জিনিসটা, আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো।

কি—কি ঠিক পেলে?

প্রবঞ্চনা, প্রতারণা—হাঁ, ঠিক তাই। জানিনে ভালো ক'রে, তবু অনুভব করি—কর্তারা কোন্ একটা লীলা করছেন। আমি ওসব চাই নে। আমি চাই সত্য এবং সত্য কি তা' আমি বেশ জানি। কর্তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলবনা আমি। আমি জানি, ওদের সুবিধার জন্য যখন দরকার হবে, তখন ওরা আমাকে সাম্‌নে ঠেলে দেবে, তারপর আমার হাড় মাড়িয়ে ওরা ওদের ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছাবে।

মা ব্যথিত সুরে বললেন, হা ভগবন, পেভেলরা কি তবে এ সব কথা বোঝেনা? না না, আমি এ বিশ্বাস করতে পারিনে। তাদের লক্ষ্য—সত্য, সম্মান, বিবেক···কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই তাদের।

কাদের কথা বলছ, মা?

সকলের কথা, প্রত্যেকের কথা। মানুষের রক্ত নিয়ে কারবার যারা করে, তারা সে মানুষ নয়।

রাইবিন মাথা নীচু করে বলে, তারা না হতে পারে, মা, কিন্তু তাদের পেছনে তো এমন একদল লোক থাকতে পারে, যাদের উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি—এমনি এমনি কেউ আর নিজেদের বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপায় না। তুমি আমার কথা ঠিক জেনে রেখো, মা, কর্তাদের কাছ থেকে কখনও কিছু ভালো পাওয়া যাবে না।

মা ভয় পেয়ে বলেন, তা' তোমার মতটা কি বলত ?

আমার মত ! কর্তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকো, ব্যস—এইমাত্র !

তারপর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থেকে ধীরে ধীরে বলে, আমি চ'লে যাচ্ছি, মা, লোকদের সঙ্গে গিয়ে মিশব, তাদের সঙ্গে কাজ করব। এ কাজের যোগ্য আমি। লিখতে পড়তে জানি, খাটতে পারি, বোকাও নই। আর সব চেয়ে বড়ো কথা, লোকদের কি বলতে হ'বে তা আমি জানি। জানি, কর্তাদের বিশ্বাস করা চলে না। জানি, মানুষের আত্মা আজ কলুষিত, বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট, সবাই পেট বোঝাই করবার জন্য ব্যগ্র—কিন্তু খাবার কই ? তাই তারা পরস্পর খাওয়া-খাওয়ি করে।···আমি যাবো গ্রামে···পল্লিতে···আর লোকদের জাগাবো। তাদের আজ নিজেদের হাতে কাজ নেওয়া দরকার, নিজেদের হাতে একাজ করা দরকার। তারা একবার বুঝুক, তারপর নিজেরাই নিজেদের পথ খুঁজে নেবে। আমি যাচ্ছি শুধু তাদের বোঝাতে, তাদের একমাত্র আশা তারা নিজেরা, তাদের একমাত্র বুদ্ধি তাদের নিজেদের বুদ্ধি, এই হচ্ছে সত্য।

মা ধীরে ধীরে বলেন, তোমায় ধরবে ওরা।

ধরবে, আবার ছেড়ে দেবে। আবার আমি এগিয়ে চল্‌বো।

চাষীরাই তোমায় বাঁধবে, তোমায় জেলে দেবে।

দিক, কিছুকাল জেলে থেকে আবার বেরুব, আবার চলবো। চাষীরা একবার বাঁধবে, দু'বার বাঁধবে, তারপর তারা বুঝবে, আমাকে বাঁধা উচিত নয়, আমার বক্তব্য শোনা উচিত। আমি তাদের ডেকে বলবো, বিশ্বাস করতে বলেছিনে তোমাদের, শুধু কথাগুলো শোন। আমি জানি, তারা যখন শুনবে, তখন বিশ্বাস করবে।

মা বলেন, তুমি মারা পড়বে, রাইবিন।

রাইবিনের কালো গভীর চোখ দু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। মার দিকে চেয়ে বললো, খৃস্ট বীজের সম্বন্ধে কি বলেছিলেন জানো.: 'তুমি মরবেনা, নতুন অঙ্কুরে জেগে উঠবে।' আমি বিশ্বাস করিনে, আমি এতো সহজে মরবো। আমি বুদ্ধি রাখি, সোজা পথে চলি; কাজেই গতি আমার অপ্রতিহত। শুধু জানিনে, কেন আমার প্রাণে ব্যথা জাগে। হাঁ...আমি যাবো...তাড়িখানায় যাবো...লোকদের কাছে যাবো।...কিন্তু এণ্ড্রি কই? এখনো আসছেনা যে! এরি মধ্যে আবার কাজে লেগেছে বুঝি!

হাঁ। জেল থেকে বেরুতে না বেরুতেই ওদের কাজ।

এইতো চাই। তাকে আমার কথা বোলো।

বলবো।

এবার উঠি।

কারখানার কাজ ছাড়বে কবে?

ছেড়ে দিয়েছি তো!

যাচ্ছ কখন?

কাল ভোরে।

রাইবিন চলে গেলো। মা একা বসে রইলেন। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তার দিকে চেয়ে মা শিউরে উঠলেন, এই অন্ধকারের জীব আমি চিরজীবন।...

এণ্ড্রি এলে মা রাইবিনের কথা বললেন। শুনে এণ্ড্রি নেচে উঠলো, যাচ্ছে?—চমৎকার! সত্যের ডঙ্কা বাজিয়ে যাক সে গ্রামে গ্রামে, লোকদের জাগিয়ে তুলুক,—আমাদের সঙ্গে এখানে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর।

মা বললেন, কর্তাদের কথা বলছিল সে। সত্যিই কি তাই? কর্তারা কি তোমাদের প্রবঞ্চিত করছেন না?

এণ্ড্রি বললো, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ বুঝি, মা?...তা' যা' বলেছে, টাকা নিয়েই যত গোলমাল। ওঃ, টাকা যদি থাক্‌তো, মা!...আমরা এখন আছি ভিখের ওপর...এইতো ধরো নিকোলাই, পঁচাত্তর রুবেল মাইনে পায়, তার পঞ্চাশ রুবেলই আমাদের দেয়। অন্যান্য সবাইও তাই। ছাত্ররা খেতে পায় না, তবুও একটি একটি ক'রে কোপেক জমিয়ে আমাদের পাঠায়। কর্তাদের কথা বলছিলে, হাঁ, তাদের মধ্যেও রকমফের আছে বৈকি! কেউ আমাদের ঠকাবে, ছেড়ে যাবে, আবার কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে, সেই উৎসব-দিবসে আমাদের সহযাত্রী হবে। সে উৎসব-দিবস...জানি তা দূরে, বহু দূরে। কিন্তু পয়লা মে আমরা একবার তার অনুষ্ঠান ক'রে আনন্দ করব।

তার কথায়, তার আনন্দে মার মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয়। এণ্ড্রি ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো, তারপর আবার বললো, জানো, মা, প্রাণের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক আশ্চর্য ভাব জাগে! যেখানে যাও, মনে হবে, সকল মানুষ তোমার কমরেড—সবার মাঝে একই আগুন দীপ্ত, সবাই আনন্দময়, সবাই ভালো। কথা নেই, অথচ সবাই সবাইকে বোঝে। কেউ কাউকে বাধা দিতে চায় না, অপমান করতে চায় না, তার আবশ্যকও বোধ করে না। সবাই একতাবদ্ধ, প্রত্যেকটি প্রাণ গায় তার নিজের গান। সমস্ত গানের তরঙ্গ সম্মিলিত হ'য়ে প্রবাহিত হয় এক বিশাল, বিরাট, মুক্ত-স্রোতা আনন্দের নদী। যখন তুমি এই কথা ভাববে, মা, যখন ভাববে, এ হ'বে, এ না হ'য়ে পারে না, তখন বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণ আনন্দে গলে যাবে। এতো আনন্দ যে, তা' তুমি

সামলাতে পারবে না. চোখ সজল হ'য়ে উঠবে।...কিন্তু এ স্বপ্ন হ'তে যখন জেগে উঠবে, যখন সংসারের দিকে চাইবে, দেখবে সব-কিছু তোমার চারিপাশে ঠাণ্ডা, নোঙরা,—সবাই শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মব্যস্ত সংসারের চল্‌তি পথে মানবজীবন কাদার মতো মথিত হচ্ছে, পদদলিত হচ্ছে। ...হাঁ...ব্যথা পাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তোমায় মানুষকে অবিশ্বাস করতে হ'বে, ভয় করতে হ'বে, ঘৃণা করতে হ'বে। মানুষ বিভক্ত, জীবন মানুষকে হু'টুক্‌রো ক'রে রেখেছে। তুমি তাকে ভালোবাসতে চাইবে, কিন্তু কি ক'রে বাসবে? কি ক'রে ক্ষমা করবে সে মানুষকে, যে তোমায় আক্রমণ করছে বন্য পশুর মতো। বুঝছেনা যে তোমার মধ্যেও একটা আত্মা আছে, তোমার মুখে—মানুষের মুখে আঘাত দিচ্ছে। তুমি ক্ষমা করতে পারোনা—তোমার নিজের কথা ভেবে নয়, মানবজাতির কথা ভেবে। নিছক ব্যক্তিগত অপমান আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু অত্যাচারীকে অপমান করার আস্কারা দিতে পারি না, মানুষকে মারার, হাত পাকাবার জন্য আমার পিঠ পেতে দিতে পারি না।...

মা চুপ করে শুনতে থাকেন। এণ্ড্রির চোখ জ্বলছে। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, নোঙরা যা' তা' আমাকে আঘাত না দিলেও তাকে আমি ক্ষমা করবোনা। আমি একা নই তুনিয়ায়। আজ যদি আমি আমাকে অপমানিত হতে দিই—হয়তো আমি তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি, গায়ে না মাখতে পারি, কিন্তু অপমানকারী যে, সে আজ আমার ওপর শক্তি পরীক্ষা ক'রে বর্ধিত-স্পর্ধায় কাল আর একজনের পিঠের চামড়া তুলবে। এই জন্যই আমরা বাধ্য হই, মানুষে মানুষে তফাৎ করতে—যারা অত্যাচারী তাদের দূরে রাখতে, যারা সত্যের জন্য লড়াই করছে তাদের আপনার বলে টেনে নিতে।...বিপদই হচ্ছে এইখানে। তু'রকম চোখ

নিয়ে তোমায় দেখতে হবে, দু'রকম প্রাণ নিয়ে তোমায় অনুভব করতে হ'বে,—একটা বলে, সবাইকে ভালোবাসো, আর একটা বলে, হুঁশিয়ার, ও তোমার দুশমন। কেন? কারণ এটা অদ্ভুত হলেও সত্য যে, মানুষ আজও এক-সমতলে দাঁড়িয়ে নেই। মানুষের মধ্যে সাম্য আনতে হ'বে আমাদের, সকল মানুষকে এক সারিতে দাঁড় করাতে হ'বে আমাদের, মাথা দিয়ে বা হাত দিয়ে মানুষ যতকিছু সুখ-সুবিধার সৃষ্টি করেছে সব আজ নিখিল মানুষের মধ্যে সমান ভাবে বেঁটে দিতে হবে। মানুষকে আর পরস্পরের ভয়ের এবং হিংসার গোলাম, লোভের এবং বোকামির দাস ক'রে রাখবোনা।

এমনি কথাবার্তা প্রায়ই চলতো মা এবং এণ্ড্রির মধ্যে। পড়াও চললো মার। চোখ তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি। এণ্ড্রি বললো, আসছে রববার শহরে নিয়ে গিয়ে তোমায় চশমা কিনে দেব।

তিন-তিনবার মা জেলে পেভেলের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, কিন্তু পারেন নি। জেলের কর্তা অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে, 'এখন হবে না, এই আসছে হপ্তায়' বলে ফিরিয়ে দিয়েছে। মা এণ্ড্রিকে বললেন, খুব নম্র কিন্তু লোকটা।

এণ্ড্রি হেসে বললে, হাঁ, বিনয়ের অভাব নেই, হাসিরও অভাব নেই। ওদের যদি বলা হয়, দেখো, এই লোকটা সাধু, জ্ঞানী, কিন্তু ও থাকলে আমাদের বিপদ। ওকে ফাঁসিতে লটকাও। বাস, আর কথা নেই। ওরা হাসতে হাসতে তাকে ফাঁসিতে লটকাবে, এবং ফাঁসিতে লটকিয়ে ওরা হাসতে থাকবে।

মা বললেন, কিন্তু আমাদের ওখানে যে লোকটি খানাতল্লাশী করতে গিয়েছিল সে একটু ভাল।

এণ্ড্রি বললো, মানুষ ওরা কেউই নয়, মা। মানুষকে আঘাত দেবার, অভিভূত করার, তাকে রাষ্ট্রের চাহিদা মতো গ'ড়ে নেবার যন্ত্র ওরা। কর্তারা যেমন খুশি ওদের চালান। ওরা না ভেবে, কেন, কি দরকার এ প্রশ্ন না ক'রে কর্তাদের হুকুম তামিল করে যায়।

অবশেষে মা একদিন ছেলের দেখা পেলেন। অনেক কথা হলো। মা শেষটা বললেন, কবে ছেড়ে দেবে তোকে? কেন জেল হ'ল তোর? ইস্তাহার তো আবার বেরিয়েছে কারখানায়।

পেভেলের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, বেরিয়েছে? কবে? কতো?

রক্ষী বাধা দিয়ে বললো, ওসব কথা বলা নিষেধ, পারিবারিক কথা বলো। অগত্যা পেভেল বললো, তুমি এখন কি করছ, মা?

মা ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, আমিই কারখানায় এইসব বয়ে নিয়ে যাই—টক, ঝোল, খাবার···

পেভেল বুঝলো। চাপা হাসির বেগে তার মুখের শিরাগুলো কাঁপতে লাগলো। বললো, তা হ'লে একটা ভালো কাজ পেয়েছ তুমি, মা। সময় তোমার মন্দ কাটছেনা।

মা বলেন, ইস্তাহার বেরুবার পর আমাকেও খুঁজে দেখেছিল।

রক্ষী বললো, আবার ঐ কথা।

এম্‌নি করে সময় উত্তীর্ণ হল। মা-ছেলে চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেন, বিদায় নিলেন।

বাড়ি এসে মা এণ্ড্রিকে বললেন, আচ্ছা এণ্ড্রি, ওরা কেমন ক'রে পারে, বলতো? আমার তো পেভেলের জন্য মুখে অন্ন রোচে না। আর

ওরা দেখি ছেলেদের জেলে পাঠিয়ে দিব্যি আছে, খায়-দায়, হাসি-গল্প করে, যেন কিছুই হয়নি।

এণ্ড্রি বল্লো, এইটেই তো স্বাভাবিক। আইন আমাদের ওপর যতটা কড়া, ওদের ওপর ততটা নয়। আর আমাদের চাইতে আইনের দরকারও ওদের বেশি। এইজন্যেই আইন যখন ওদের নিজেদের মাথায় ঘা দেয়, ওরা কাঁদলেও জোরে কাঁদেনা—নিজের লাঠি নিজের মাথায় পড়লে তত লাগেনা! ওদের কাছে আইন রক্ষা-কর্ত্তা, আর আমাদের কাছে আইন শৃঙ্খল—যা' আমাদের হাত-পা বেঁধে পঙ্গু, দুর্বল ক'রে রেখেছে, আমাদের আঘাত দেবার শক্তি লোপ করেছে।

দিন তিনেক পরে নিকোলাই কারামুক্ত হয়ে পেভেলদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঘরে আলো দেখতে পেয়ে সে এসে ঢুকলো, বল্লো, আমি সোজা জেল থেকে আসছি, মা।

তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত, দৃষ্টি বিষণ্ণ, সন্দিগ্ধ! মা কোনদিনই তাকে পছন্দ করতেন না, কিন্তু আজ এই ছেলেটির দিকে চেয়েও কেমন এক দরদে তাঁর প্রাণ ভরে গেলো, বল্লেন, শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গেছিস যে, বাবা! দাঁড়া, চা করে দিচ্ছি।

এণ্ড্রি রান্নাঘর থেকে ব'লে উঠলো, আমিই কচ্ছি চা!

মা তখন বলেন, ফেদিয়া মেজিন কেমন আছে রে? কবিতা লিখছে, না?

নিকোলাই মাথা নেড়ে বলে, হাঁ, কিন্তু আমি ছাই কিছু বুঝিনা তা'। একটা খাঁচায় রেখেছে তাকে, আর সে গান করছে। একটা জিনিস আমি খাঁটি বুঝেছি—আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।

মা সমবেদনার সুরে বলেন, ইচ্ছে থাকবে বা কেন! কিসের মায়ায় সে শূন্যপুরীতে যাবি?

নিকোলাই বললো, সত্যিই শূন্যপুরী, মা। শুধুই পোকা-মাকড়ের বাসা। এখানে আজকের রাতটা থাকতে পারি, মা?

মা বলেন, ছেলে মার কাছে থাকবে তারও কি আবার অনুমতি নিতে হয়, বাবা!

নিকোলাই আপন মনে কত কি ব'লে চলে। এণ্ড্রি রান্নাঘর থেকে আসতে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, আমার মনে হয়, এমন কতকগুলো লোক আছে, যাদের মেরে ফেলা উচিত।

এণ্ড্রি গম্ভীরভাবে বললো, তাই নাকি! কিন্তু কেন শুনতে পারি কি?

যাতে তারা চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বটে! কিন্তু জ্যান্ত লোকগুলোকে ঠাণ্ডা করার অধিকার তোমায় কে দিলে?

দিয়েছে তারা নিজেরা।......তারা যদি আমায় আঘাত দেয়, আমার অধিকার আছে জবাবে তাদের আঘাত করার, তাদের চোখ উপ্‌ড়ে ফেলার। আমায় ছুঁয়ো না, আমিও তোমায় ছোঁব না। আমায় যেমন খুশি চলতে দাও, আমি চুপ-চাপ থাকবো, কাউকে ছোঁবও না। হয়তো বনে চ'লে যাবো, নদী-তীরে কুঁড়ে বেঁধে একা থাকবো।

এণ্ড্রি বললো, যাও না, খুশি হয় তাই গে থাকো।

এখন?...নিকোলাই ঘাড় নেড়ে বলে, এখন তা অসম্ভব।

কেন? অসম্ভব কেন? আটকাচ্ছে কে তোমায়?

আটকাচ্ছে মানুষ। আমরণ তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে হ'বে আমায়—অন্যায় এবং ঘৃণার বাঁধনে। শক্ত সে বাঁধন! আমি তাদের

ঘৃণা করি, তাই তাদের ছেড়ে যাবো না। তাদের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবো, তাদের জ্বালিয়ে মারবো আজীবন। তারা আমার শত্রুতা করেছে, আমিও তাদের শত্রুতা করব! কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয় তো দেব আমার নিজের কাজের কৈফিয়ৎ। আমার বাবা যদি চোর হয়··· বলতে বলতে থেমে গেলো নিকোলাই। তারপর হঠাৎ উষ্ণ হ'য়ে ব'লে উঠলো, আইছে-গবর্ভব ব্যাটার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব, দেখে নিয়ো।

এণ্ড্রি ব্যগ্র-কৌতূহলে বললো, কেন বলো তো?

ব্যাটা স্পাই, লোকের সর্বনাশ ক'রে বেড়াচ্ছে। ব্যাটার জন্য আজ আমার বাবা পর্যন্ত স্পাই হবার মতলব করছেন।

এণ্ড্রি বুঝলো, নিকোলাইর প্রাণে কী মর্মন্তুদ ব্যথা, কী অসহ্য যাতনা—এর সান্ত্বনা নেই। যুক্তিতে এ প্রশমিত হয় না, শুধু বললো, ভাই, আমরাও ভুক্তভোগী, আমরাও একদিন অমনি ক'রে ভাঙা কাঁচ মাড়িয়ে রক্তাক্ত পদে চলেছি জীবন-পথে, অন্ধকারে আমরাও অমনি আলোর জন্য হা-হা করেছি।

নিকোলাই বললো, তুমি আমায় বোঝাতে চেয়ো না, বন্ধু, বোঝাবার কিছু নেই। আমার বুকে হাত দিয়ে দেখো—মনে হচ্ছে যেন ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ নেকড়ের দল গর্জন করছে।

এণ্ড্রি বলে, একদিন এ দূর হ'বে—সম্পূর্ণভাবে না হলেও, হবে। শিশুর হামের মতো এও মানুষের একটা ব্যাধি। সবাই আমরা এতে ভুগি। যারা শক্তিমান্ তারা ভোগে বেশি। যারা দুর্বল, তারা ভোগে কম। এ ব্যাধি কখন আসে, জানো? যখন মানুষ নিজেকে চিনেছে কিন্তু জীবনের পূর্ণ পরিচয় পায়নি, জীবন-যাত্রায় নিজের স্থান খুঁজে পায়নি। তা না পেয়ে নিজের দামও কষতে পারেনি। তখন তার

কেবলই মনে হয়, দুনিয়ার বুকে অপূর্ব চিজ সে, কেউ তাকে মাপতে পারে না, কেউ তার দাম তলিয়ে দেখে না, সবাই চায় তাকে হজম ক'রে ফেলতে। পরে সে বুঝতে পারে, অন্যান্য বহু মানুষের মধ্যে যে প্রাণ তাও তারই মতো······তখন থেকে তার মন নরম হ'তে থাকে, ব্যাধি উপশম হ'তে থাকে। লজ্জা জাগে, বোঝে যে, মন্দিরশীর্ষে উঠে একা নিজের ঘণ্টাটি বাজিয়ে লোককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বৃথা—মন্দিরের বড় ঘণ্টা তার ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনিকে ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠে। বড় ঘন্টার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাগতে হ'লে চাই ছোট ছোট ঘন্টাগুলির একত্র সম্মিলন। আমি কি বলতে চাচ্ছি. বুঝতে পাচ্ছ নিকোলাই ?

হঁা, কিন্তু বিশ্বাস করি না।

থাবার এলো। খেতে খেতে এণ্ড্রি নিকোলাইকে বোঝাতে লাগলো, কারখানায় কেমন ভাবে সোশিয়ালিস্ট মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। নিকোলাই সব শুনলো, তার মুখ আবার গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, বললো, বড্ডো ধীরে চলছে কাজ, বড্ডো ধীরে। আরও তাড়াতাড়ি হলে ভালো হয়।

এণ্ড্রি বলে, মানুষের জীবনটা তো ঘোড়া নয়, নিকোলাই, যে, চাবুক ক'ষে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে।

নিকোলাই সেই একই সুরে বলতে লাগলো,···কিন্তু বড্ডো ধীরে, ধৈর্য থাকে না আমার। কি করি, কি করি! তার অঙ্গভঙ্গিতে গভীর নৈরাশ্য ফুটে ওঠে।

এণ্ড্রি বলে, আমরা করব জ্ঞান লাভ এবং জ্ঞান বিস্তার।

যুদ্ধ করব কবে? নিকোলাই সহসা প্রশ্ন করলো।

এণ্ড্রি হেসে বলে, যুদ্ধ কখন করতে হ'বে তা জানি না, কিন্তু

এটা জানি যে তার আগে আমাদের বহু প্রাণ আহুতি দিতে হবে, আর জানি যে, হাতের ছুরি শানাবার আগে শানাতে হবে মগজের বুদ্ধিকে'

এবং প্রাণকে—নিকোলাই যোগ করে।

হাঁ, প্রাণকেও।

কিছু পরে নিকোলাই উঠে শুতে গেলো। মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ওর মনের মধ্যে কী একটা ভীষণ চক্রান্ত ঘুরছে, এণ্ড্রি।

হাঁ, মা, ওকে বোঝা বড়ো শক্ত, ব'লে এণ্ড্রিও বিছানায় গেলো। শুনতে পেলো, মা বলছেন, ভগবন্, পৃথিবীর যত মানুষ সবাই তো দেখছি কাঁদছে নিজ নিজ ব্যথায়। কোথায় মানুষ সুখী, কোথায় মানুষ আনন্দিত?

এণ্ড্রি, বললো, আসচে, মা, সে শুভদিন আসচে, যে-দিন মানুষ সুখী হবে, আনন্দিত হবে।...

—চোদ্দ—

জীবন বয়ে চলে এমনি দ্রুত তালে। নিয়মিতভাবে মার ওখানে কর্মীরা মেলে, মতলব আঁটে, কাজ করে। মা কারখানায় ইস্তাহার ছড়ান,—ইস্তাহার বেরুবার পরদিন রক্ষীরা মাকে পরীক্ষা ক'রে বিফলকাম হয়। মার আরব্ধ-ব্রতের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ে।

নিকোলাইর কারখানার কাজ গেছে, এখন কাজ করে এক কাঠের গোলায়, আর রোজ মার ওখানে মজলিসে যোগ দেয়। সবাই চলে

যাবার পরও সে থাকে। একা এণ্ড্রির মুখোমুখি বসে প্রশ্ন করে, কিন্তু মানুষ যে আজ সর্বহারা, তার জন্য সব চেয়ে বেশি দায়ী কে—কার?

এণ্ড্রি বলে, দায়ী সেই, যে প্রথম উচ্চারণ করেছিল, 'এই আমার জিনিস।' কিন্তু সে লোকটা মারা গেছে বহু হাজার বছর—তার ওপর রাগ ঝাড়বার উপায় নেই।

কিন্তু ধনী আর তাদের মুরুব্বীরা—তাদের কথা কি বলছ? তারা কি নির্দোষ?

এণ্ড্রি তার জবাবে বহু যুক্তিপূর্ণ কথা বলে,—নিকোলাইর মন প্রসন্ন হয় না। সাধারণ মানুষও যে সব দোষের সঙ্গে জড়িত, একথাটা তার মন মানতে চায় না। একদিন সে বলে, দুনিয়া থেকে ঐ দুষ্ট আগাছা-গুলোকে নির্দয়ভাবে চষে ফেলতে হ'বে আমাদের।

মা বলেন, আইছেও এম্‌নি কথা বলেছিল।

স্পাই আইছের নাম শুনে মুহূর্তে নিকোলাইর মন কঠিন হ'য়ে উঠলো। বললো, একজন দোষী ঐ। ব'লে চ'লে গেলো।

এণ্ড্রি বললো, সত্যিই আইছে বড় বেড়ে উঠেছে, মা। রাতদিন ও লোকদের ধরিয়ে দেবার মতলবে ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরছে। নিকোলাই একদিন ওকে ধ'রে আচ্ছা মতো দিয়ে দেবে। কর্তারা জনসাধারণের মন কী পর্যন্ত বিষিয়ে তুলেছে দেখ। নিকোলাইর মতো লোকেরা যখন অন্যায়ের অত্যাচারে ধৈর্য হারাবে, তখন কী ভীষণ ব্যাপার হবে! পৃথিবী হবে রক্ত-রঞ্জিত, আকাশেও যেয়ে সে রক্তের ছোপ লাগবে।

একদিন অকস্মাৎ পেভেল এসে হাজির হ'ল। মার বুক আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। মা এণ্ড্রিকে ডাকলেন। তিন জনে প্রাণ খুলে

কথা বলতে লাগলো। মা খাবার নিয়ে এলেন। খেতে খেতে এণ্ড্রি রাইবিনের কথা তুললো। পেভেল বললো, আমি থাকলে তাকে যেতে দিতুম না। কি সম্বল ক'রে বেরুলো সে ?—অসন্তোষ এবং অজ্ঞানান্ধকার।

এণ্ড্রি হেসে বলে, চল্লিশ বছর অবিরত সংগ্রাম করার ফলে অন্তর যার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তাকে বাগ মানানো সোজা নয়, বন্ধু।

পেভেল কঠিন স্বরে বললো, কেন ? তুমি কি মনে কর, জ্ঞান মানুষের মনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি দূর করতে পারে না ?

এণ্ড্রি অর্থপূর্ণ ভাষায় বললো, একলাফে একেবারে আকাশে উঠতে যেয়ো না, পেভেল, দুর্গের চূড়ায় ঘা খেয়ে ডানা ভেঙে যাবে।

তারপর চললো দুই বন্ধুতে বিতর্ক। মা তার এক বর্ণও বুঝতে পারলেন না, শুধু বুঝলেন, পেভেল চাষীদের কথা ভেবে তাদের জন্য নির্ধারিত পন্থার একচুল এদিক-ওদিক যেতে রাজি নয়। এণ্ড্রি চাষীদের পক্ষে, বলে, তাদেরও শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হ'বে। এর মধ্যে এণ্ড্রির মতটাই মার মনে লাগে। এমনি ক'রে খাওয়া শেষ হয়, দিন কাটে।

পনেরো

মে মাসে মজুরদের একটা উৎসবের আয়োজন হ'ল। বন্দী মজুররা সবাই জেল থেকে এসেছে। উৎসবের ধরণ সম্বন্ধে দু'দলের দু'মত। একদল বলে, সশস্ত্র হ'য়ে মজুরদল বেরিয়ে পড়ুক ; আর একদল বলে,

না। মজুররা দলে দলে নিশান হাতে সাম্য মন্ত্র ধ্বনিত ক'রে শোভাযাত্রা করুক'। শেষোক্ত দলই ভাবি। আইভানোভিচ বললো, বন্ধুগণ, বর্তমানের এই ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া একটা মহান্ কাজ, কিন্তু তার জন্য সবার প্রথমেই চাই আমার জন্য একজোড়া ওভার-সু, এ ছেঁড়া জুতোর বদলে; কারণ এই ওভার-সুই সোসিয়ালিজমের জয়-যাত্রায় আমাদের সব চেয়ে বেশি কাজে লাগবে। এই পুরাণো ব্যবস্থাকে খোলাখুলি উলটে ফেলে না দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে একপাও যেতে চাই না আমি... তাই তো বলি, অস্ত্র এখন থাক।

মা তাদের বাদানুবাদ শুনতেন। তাদের মুখেই শুনলেন তিনি, একদল লোক, যাদের বলে বুর্জোয়া, তারাই জনসাধারণের শত্রু। জার যখন ছিলেন, তখন তারা জনসাধারণকে ক্ষেপিয়েছে জারের বিরুদ্ধে, তারপর জনসাধারণ যখন জারকে সরিয়েছে সিংহাসন থেকে, তখন তারা ছলা-কলায় শক্তি আত্মসাৎ ক'রে জনসাধারণকে কোণ-ঠ্যাসা ক'রে রেখেছে,—জনসাধারণ এর প্রতিবাদ করলে তাদের হত্যা করেছে শতে শতে, সহস্রে সহস্রে, মানুষকে চিবিয়ে, পিষে, চুষে মারছে তারা। এই বুর্জোয়াদল...এই ধনীদল...সোনার ভারে প্রাণ তাদের চাপা পড়ে গেছে। এরা মানবজাতির নিষ্ঠুরতম শত্রু, প্রধানতম প্রবঞ্চক, সর্বাপেক্ষা উগ্র বিষ-পতঙ্গ।

শশেংকাও আসে প্রায়ই। মা একদিন আড়াল থেকে শুনতে পান পেভেল আর সে কথা বলছে।

তুমিই নিশান বয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

হাঁ।

ঠিক হ'য়ে গেছে?

হাঁ, আমিই এর অধিকারী।

অর্থাৎ আবার তুমি জেলে যাবে। এ কি সম্ভব হ'ত না…

কি?

যে, আর কেউ নিশান ব'য়ে নিয়ে যেতো?

না।

একবার ভেবে দেখ, কত প্রভাব তোমার। সবাই তোমায় কত পছন্দ করে! তোমার আর নাখোদ্‌কার মতো নামজাদা বিপ্লবপন্থী আমাদের মধ্যে আর নেই। একবার ভেবে দেখ, মুক্তিকল্পে কত-কি করার শক্তি আছে তোমার। তাই তো তোমাকে পেলে তারা ছাড়বে না, দীর্ঘকালের জন্য দূরে সরিয়ে ফেলবে তোমায়।

না শশা, আমি সংকল্প করেছি, কোন-কিছুই সে সংকল্প থেকে আমায় টলাতে পারবে না।

পারবে না? যদি আমি অনুরোধ ক'রে বলি,' পেভেল…

এমন অনুরোধ তোমার করা উচিত নয়, শশা।

উচিত নয় পেভেল! আমি মানুধ, রক্ত-মাংসধারী মানুষ।

শুধু মানুষ নও, অতি-মানুষ। তাইতো তোমাকে আমি ভালোবাসি এবং জানি তুমি অমন অনুরোধ করতে পারো না।

তবে যাও পেভেল…ব'লে শশা তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

মার মন আবার আশঙ্কায় দুলে উঠে। পেভেলের সঙ্গে দেখা হ'লেই জিগ্যেস করেন, পয়লা মে আবার কি করতে চাস?

পেভেল বলে, নিশান হাতে শোভাযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যাবো। এতে জেল হবে বলে মনে হয়।

মার চোখ সজল হ'য়ে এলো। পেভেল মার হাত ধরে বললো, আমায় এযে করতেই হবে, মা। এতেই আমার সুখ, তুমি কি এতে বাধা দেবে, মা!

না, বাধা দেবো না—মা ধীরে ধীরে বলেন।

তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি পেভেলের চোখ এড়ালোনা, বললো, দুঃখ করো না, মা, এতে তো আনন্দ করা উচিত। কবে আমাদের দেশে তেমন মা হবে, যাঁরা হাসিমুখে ছেলেদের মৃত্যুর মুখে তুলে দেবেন?

এণ্ড্রি চিমটি-কাটার মতো ক'রে বললো, ওহে, একটু আস্তে আস্তে চালাও······

মা বললেন, না, তোমায় আমি বাধা দেবো না, পেভেল, কিন্তু কান্না ···আমি কেমন ক'রে রোধ করব···আমি যে মা···

এক রকমের ভালোবাসা আছে, যা মানুষের সমস্ত জীবনটাকে মাটি করে দেয়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এই কথা ব'লে পেভেল মার কাছ থেকে সরে যায়।

মা কেঁপে উঠলেন। পেভেল পাছে আরো এমনি নিষ্ঠুর আঘাত দেয়, সেই আশঙ্কায় তিনি বলেন, বাধা দেবো না, পেভেল, বাধা দেবো না। আমি বুঝি, সঙ্গীদের জন্য আজ তোকে একাজ করতেই হবে।

পেভেল বললো, সঙ্গীদের জন্য নয়, তাদের জন্য হ'লে না ক'রেও পারতুম। এ আমার নিজের জন্য দরকার।

মা চ'লে গেলেন। এণ্ড্রি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। এবার এগিয়ে এসে মায়ের ওপর পেভেলের অনাবশ্যক রূঢ়তার প্রতিবাদ করলো, বললো, এমন স্নেহময়ী মায়ের ওপর এমন আস্ফালন করার কোনই দরকার ছিল না, ওর এক কাণাকড়িরও কদর নেই।

পেভেল নিজের ভুল বুঝতে পেরে মার কাছে ক্ষমা চাইলো, অবুঝ ছেলেকে ক্ষমা কর, মা।

মা ছেলের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে আর্তকণ্ঠে বলেন, যা' দরকার তো করিস বাবা, শুধু বুড়ো মাকে কাঁদাসনি।

এণ্ড্রিকে ডেকে বললেন, ও তোর অবুঝ ছোট ভাই, ওকে বকিসনি বাবা।

এণ্ড্রি বললো, শুধু বকা! হতভাগাকে ধ'রে একদিন আচ্ছা মতো দিয়ে তবে ছাড়বো।

না বাবা, না বাবা, ব'লে মা এণ্ড্রির হাত ধরলেন।

এণ্ড্রি তখন বললো, তুমি পাগল হয়েছ, মা, আমি পেভেলের গায়ে হাত দোব! আমি ওকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি দেখতে পারি না হতভাগাকে। নতুন জামা পরেছেন উনি, তাই গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না, যাকেই পায় তাকেই ঠেলা দিয়ে বলে, দেখ, কেমন জামা পরেছি। জামাটা ভালো, কিন্তু হ'ক ভালো, তাই ব'লেই কি লোককে এমনি করে ঠেলতে হ'বে? বলে, এমনিতেই মানুষ হ'য়ে আছে অতিষ্ঠ...

পেভেল হেসে বললো, কতক্ষণ মুখ চালাবে আর? কম তো বাক্যবাণ নিক্ষেপ করনি?

এণ্ড্রি মেঝের উনুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ছিলো। পেভেল নুয়ে পড়ে তার হাত জড়িয়ে ধরলো।...তার কিছুক্ষণ পরেই দু'ভাইয়ের মতোই তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল। দেখে মার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভ'রে উঠলো। তারপর যেন তিনি লজ্জিত হ'য়ে বললেন, এ মেয়ে মানুষের চোখের জল, দুখেও ঝরে, সুখেও ঝরে।

পেভেল বললো, এ চোখের জলে লজ্জিত হবার কিছু নেই, মা।

এণ্ড্রি বললো, গর্ব করা উচিত নয়, কিন্তু সত্যিই আমরা এক নবজীবনের আস্বাদ পাচ্ছি এখন। এ জীবন খাঁটি, মনুষ্যোচিত, প্রেমে, মঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পেভেল মার দিকে চেয়ে বললো, হাঁ।

মা বললেন, জীবনের ধারা যেন বদলে গেছে। আজ এসেছে নতুন রকমের দুঃখ, নতুন ধরণের আনন্দ। তা যে কী, তা জানি নে, বুঝি নে, ব্যক্তও করতে পারিনে ভাষায়।

এণ্ড্রি বললো, এই তো হওয়া উচিত। দুনিয়ার দিকে নজর দিয়ে দেখো, মা, একটা নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে, একটা নতুন প্রাণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে! এতকাল সকল প্রাণ ছিল স্বার্থের সংঘাতে নিপীড়িত, অন্ধলোভে জর-জর, হিংসা-বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত, মিথ্যা-ভীরুতা-হীনতায় দূষিত, রোগজীর্ণ, শঙ্কিত-জীবন, কুহেলির যাত্রী,—নিজের ব্যথাভারে ক্রন্দনোন্মুখ,—হঠাৎ তারি মধ্য থেকে জেগে উঠেছে এক নতুন মানুষ, যুক্তির আলোকে জীবনকে সে আলোকিত করেছে। মানুষকে ডেকে বলছে, ওগো পথ-ভ্রান্ত বন্ধুর দল, আজ দিন এসেছে এ সত্য উপলব্ধি করার যে, তোমাদের সবার স্বার্থ এক, তোমাদের প্রত্যেক মানুষের বাঁচবার দরকার আছে, বাড়বার দরকার আছে। আজও সে একা, তাই কণ্ঠস্বর তার এতো তীব্র। তার আহ্বানে খাঁটি কর্মীরা একপ্রাণ হ'য়ে দাঁড়ায়, বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে নব বাণী, হে আমার দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, তোমরা মিলিত হ'য়ে এক মানবগোষ্ঠী গঠন কর! তোমাদের জীবনের প্রসূতি প্রেম—ঘৃণা নয়। আমি শুনতে পাচ্ছি, বিশ্বময় আজ সেই বাণীই প্রতিধ্বনিত···রাতে বিছানায় শুয়ে···একা জেগে...সর্বত্র এই বাণী শুনি, আর প্রাণ নেচে ওঠে। দুঃখ, অন্যায়ের ভারে প্রপীড়িতা এই

ধরণীও সে আহ্বানে সাড়া দেয়, কেঁপে কেঁপে ওঠে, আর মানুষের হৃদয়াকাশে উদিত নবারুণকে সংবর্ধিত করে।…

পেভেল তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, মা বাধা দিয়ে বললেন, ওর কথা শেষ করতে দে।

দীপ্তোজ্জ্বল চক্ষু তুলে এণ্ড্রি বললো, কিন্তু জানো, এখনো অনেক দুঃখ সইতে হবে মানুষকে, লোভের হাতে এখনো তার অনেক রক্তপাত হ'বে,…কিন্তু আমাদের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত রক্তও কম মূল্যবান্ মনে হ'বে তার কাছে, যা' আমরা এরি মধ্যে পেয়েছি উদ্বেল বক্ষে, চঞ্চল মনে, শিরায় শিরায়। তারা যেমন সোনার আলোকে ধনী, আমিও তেমনি ধনে ধনী হয়েছি। সমস্ত বোঝা আমি বইব, সমস্ত দুঃখ আমি সইব; কারণ প্রাণে আমার সেই আনন্দের সাড়া পেয়েছি, যা' কেউ কোনো-কিছুতে চেপে রাখতে পারে না। এই আনন্দের মধ্যে নিখিল শক্তি নিহিত।

নব-জীবনকে এমনিভাবে অভিনন্দিত করতে লাগলো তারা।

—ষোল—

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই কর্সুনোভা ছুটে এলো, শীগ্‌গির এসো, আইছেকে কে খুন করেছে।

শুনেই মার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। আততায়ী ব'লে চকিতে একজনকে তিনি সন্দেহ করলেন। বললেন—কে খুন করলো?

খুনী কি এখনো সেখানে ব'সে আছে?

কম্‌নোভা বললো, ভাগ্যিস্ তোমরা সবাই বাড়ি ছিলে? আমি দুপুর রাতে জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে গিয়েছিলুম!

পথে যেতে যেতে মা ভীত হ'য়ে বললেন, কি বলছ তুমি? আমরা খুন করেছি, একথা কারু স্বপ্নেও আসতে পারে?

পারে। তোমরা ছাড়া মারবে কে! তোমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতো সে, এ তো রাজ্যসুদ্ধ লোক জানে।

মার মনে আবার নিকোলাইর কথা জেগে উঠে।

কারখানার দেয়ালের অদূরে লোকের ভিড়—সেখানে আইছের মৃত দেহ। রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্ট বোঝা যায়, কেউ গলা টিপে মেরেছে।

একজন ব'লে উঠলো, পাজী ব্যাটার উচিত শাস্তি হয়েছে!

কে—কে বললো একথা, ব'লে পুলিসরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো শবের কাছে। লোকরা ছুটে পালালো। মাও বাড়ি চ'লে এলেন। এণ্ড্রি পেভেল বাড়ি এলে জিগ্যেস করলেন, কাউকে ধরেছে?

শুনিনি তো, মা।

নিকোলাইর কথা কিছু বলছে না?

না। এ ব্যাপারে তার কথা কেউ ভাবছেই না। সে কাল নদীতে গেছে, এখনো ফেরেনি।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

খেতে ব'সে চামচে রেখে পেভেল হঠাৎ ব'লে উঠলো, এইটেই আমি বুঝি নে।

কি?—এণ্ড্রি বললো।

পেভেল বললো, উদরপূরণ করার জন্য যে হত্যা, তা অত্যন্ত বিশ্রী! হিংস্র জানোয়ারকে হত্যা—হাঁ, তা বুঝতে পারি,—মানুষ যখন হিংস্র

পশুতে পরিণত হ'য়ে মানবজাতির ওপর অত্যাচার করতে যায়, তাকে আমি নিজ হাতে হত্যা করতে পারি। কিন্তু এইরূপ ঘৃণ্য তুচ্ছ কীটকে হত্যা করা—আমি বুঝিনে কেমন ক'রে এ কাজে মানুষের হাত ওঠে।

এণ্ড্রি বললো, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের চাইতে সে বড় কম ছিল না।

তা জানি।

আমরা মশা মারি…যৎসামান্য রক্ত সে খায়, তা জেনেও।

পেভেল বললো, আমি ও সম্বন্ধে কিছুই বলছিনে। শুধু বলছি, এ অত্যন্ত ছোট কাজ।

এণ্ড্রি বললো, কিন্তু ও ছাড়া কি করতে পারো তুমি?

পেভেল বহুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললো, তুমি পারো অমনভাবে একটা মানুষকে খুন করতে?

এণ্ড্রি দৃঢ়কণ্ঠে বললো, নিজের জন্য কোনো জীবিত প্রাণীকে আমি ছোঁবও না; কিন্তু ব্রত-সিদ্ধির জন্য, বন্ধুদের হিতার্থে আমি সব-কিছু করতে পারি—এমন কি তার সর্বনাশ সাধনও করতে পারি—নিজের ছেলেকে পর্যন্ত…

মা শিউরে বললেন, কি বলছ বাবা!

এণ্ড্রি হেসে বললো; সত্যি বলছি, মা, এ আমরা করতে বাধ্য…এই আমাদের জীবন।

পেভেল চুপ ক'রে রইলো। এণ্ড্রি হঠাৎ যেন কি এক ভাবের প্রেরণায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, মানুষ কি ক'রে একে ঠেকিয়ে রাখবে? মাঝে মাঝে অবস্থার ফেরে প'ড়ে বাধ্য হ'য়ে এক একটা মানুষের ওপর এমন কঠোর হ'য়ে উঠ্‌তে হয়, সেই নবযুগকে

আহ্বান ক'রে আনার জন্য, যখন মানুষের পক্ষে সম্ভব হ'বে, পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে জড়িয়ে পড়ার। জীবনের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন যারা নিজেদের শান্তি এবং সম্মানের খাতিরে মানুষকে বিক্রয় ক'রে যারা অর্থ সঞ্চয় করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার দাঁড়ানো চাই-ই। সাধু লোকদের পথে দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের সর্বনাশ করতে চায় যে যুডাস তাকে বাধা না দিলে আমিও যুডাসের মতো অপরাধী হবো। এ পাপ? এ অন্যায়? আমি জিগ্যেস করি, ঐ যে কর্তারা—ওরা কোন্ অধিকারে সৈন্য রাখে? জল্লাদ রাখে? কারাগার, দণ্ডনীতি, ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের সুখ-সুবিধা, নিরাপত্তার পথ খোলসা করে? যদি কখনো এমন হয় যে, তাদের দণ্ড দেবার ভার আমি তুলে নিতে বাধ্য হই, তখন আমি কি করব? হাঁ, আমি দেবো ওদের দণ্ড, ভয় খাবো না। ওরা মারে আমাদের দশে দশে, শ'তে শ'তে। আমারও অধিকার আছে হাত তোলার,—সব চেয়ে কাছে যে শত্রু, সব চেয়ে যে বাধা জন্মায় তাকে আঘাত করার। এই হচ্ছে যুক্তি, কিন্তু…তবু আমি স্বীকার করি, ওদের মারা নিষ্ফল—বৃথা রক্তপাত। সত্য জন্মায় একমাত্র আমাদের নিজেদের বুকের রক্ত-ভেজা জমিনে। আমি জানি তা, কিন্তু আমি এ পাপ করব—দরকার যখন হ'বে তখন নির্মম হ'বো। আমি একমাত্র আমার কথাই বলছি। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ পাপ মুছে যাবে, ভবিষ্যতের গায়ে তার কোনো চিহ্ন থাকবে না, আর কারুর নাম এতে কলঙ্কিত হবে না।…

এণ্ড্রি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো ঘরময়। তারপর বললো, জয়-যাত্রার পথে এমন অনেক সময় হ'বে যখন তোমার নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'বে নিজেকে, তোমার প্রাণ, তোমার যথা-সর্বস্ব ত্যাগ

করতে হবে। প্রাণ দেওয়া, ব্রতকল্পে জীবন উৎসর্গ করা—সে তো সোজা। আরো চাই, আরো দাও। তাই দাও, যা' তোমার জীবনের চাইতেও প্রিয়। তখনই তুমি দেখবে, জীবনের প্রিয়তম বস্তু যে সত্য, তার অদ্ভুত জীবনী-শক্তি।

ঘরের মাঝখানে সে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর চোখ আদ্ধেক বুঁজে বিশ্বাস-দৃঢ়-কণ্ঠে বলতে লাগলো আবার,··· এমন সময় আসবে জানি, যখন মানুষ মানুষের সাহচর্যে আনন্দ পাবে, যখন নক্ষত্রের মতো একে অন্যকে আলো দেবে, যখন মানুষমাত্রের কানে বাজবে মানুষের কথা সঙ্গীতের মতো। মানুষ হ'বে সেদিন মুক্তিতে মহান, খোলা প্রাণে ঘুরবে ফিরবে তারা। হিংসা থাকবে না, বিদ্বেষ থাকবে না, লোভ থাকবে না, মানুষের যুক্তি অবজ্ঞাত হ'বে না। জীবন হ'বে মানুষের সেরা। মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠবে—কারণ তখন সে মুক্ত। তখন আমরা জীবন কাটাবো সত্যে, স্বাধীনতায়, সৌন্দর্যে। তখন তারাই হ'বে তত শ্রেষ্ঠ, যারা যত বেশি প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরতে পারে, মানুষকে যত বেশি ভালোবা' সতে পারে। সর্ব চেয়ে মুক্ত যারা, তারাই হবে সব চেয়ে মহান্, সব চেয়ে সুন্দর। তখন গৌরবমণ্ডিত হ'বে জীবন, গৌরবমণ্ডিত হ'বে জীবনের অধিকারী মানুষদল।···এই জীবনের জন্য আমি সব-কিছু করতে প্রস্তুত। দরকার হ'লে আমি নিজ হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে আনবো, নিজ পায়ে তা দলিত করব।···

উত্তেজনায় এণ্ড্রি কাঁপতে লাগলো।

পেভেল মৃদুকণ্ঠে জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে তোমার, এণ্ড্রি ?"

শোনো, আমিই তাকে খুন করেছি।

পেভেল বুঝলো, তাই এণ্ড্রি আজ এত চঞ্চল। এণ্ড্রির জন্য

সহানুভূতিতে তার বুক ভরে গেলো। মা এই ব্যথিত ছেলেটিকে স্নেহ দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইলেন।

এণ্ড্রি বললো, তাকে কেন খুন করলুম, জানো? আমায় অপমান করেছিল—মানুষের পক্ষে চরম অপমান। এমন অপমান করতে আমায় কেউ কখন সাহস করেনি। আমি কারখানার দিকে যাচ্ছি, সে আমার পিছু নিয়ে বলতে লাগলো, আমাদের সবার নামই নাকি পুলিসের খাতায় আছে, পয়লা মের আগে সব্বাইকে শ্রীঘরে যেতে হ'বে। আমি কোনো জবাব দিলুম না, হাসলুম; কিন্তু রক্ত আমার টগ্ বগ্ ক'রে ফুটে উঠলো। তারপর সে বললো, তুমি চালাক লোক…এ পথে না চ'লে তোমার উচিত আইনের কাজে প্রবেশ করা, অর্থাৎ গোয়েন্দা হওয়া…ওঃ, কি অপমান, পেভেল! এর চাইতে মুখের ওপর ঘুসি মারলো না কেন সে! তাও হয়তো সইতে পারতুম। কিন্তু এ অসহ্য! মাথায় খুন চেপে গেলো। পেছন দিকে এক ঘুসি চালালুম…তারপর চ'লে গেলুম। ফিরে তাকালুমও না। শুনলুম সে ধপ ক'রে পড়ে গেলো নীরবে। মারাত্মক যে কিছু হয়েছে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি শান্তভাবে চ'লে গেলুম, যেন আর কিছু করিনি, একটা ব্যাঙকে লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে রেখেছি।…তারপর কাজ করতে করতে শুনলুম, আইছে খুন হয়েছে। কথাটা আমার এমন-কি বিশ্বাসও হ'ল না—কিন্তু হাত যেন কেমন অসাড় হ'য়ে এলো…এ পাপ নয় আমি জানি, কিন্তু এ নোঙরা কাজ…সমস্ত জীবনেও যার কালিমা আমি ধুয়ে ফেলতে পারব না।

পেভেল সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললো, তা এখন কি করতে চাও, এণ্ড্রি?

কি কোরব?…আমি খুন করেছি, একথা কবুল করতে ভয় খাইনে আমি। কিন্তু লজ্জা হয়…এমন একটা তুচ্ছ কাজ ক'রে জেলে যেতে

লজ্জা হয়। কিন্তু অন্য কেউ যদি এর জন্য অভিযুক্ত হয়, তা'হলে আমি গিয়ে ধরা দেবো; নইলে যেমন আছি তেমনি থাকবো।

সেদিন কেউ আর কাজে গেলো না। পেভেল আর মা এণ্ডির কথাই বলতে লাগলো। পেভেল বললো, এই তো দেখ, মা, আমাদের জীবন। এমনভাবে আমরা আছি পরস্পর সম্পর্কে যে ইচ্ছে না থাকলেও আঘাত করতে হয়। কাদের? ঐ সব ঘৃণ্য নির্বোধ জীবদের, সৈন্য, পুলিস, গোয়েন্দাদের...যারা আমাদের মত মানুষ, কিন্তু যাদের রক্ত আমাদেরই মতো শোষিত হচ্ছে অহর্নিশ, যারা আমাদেরই মত মানুষ হ'য়েও মানুষ ব'লে গণ্য হচ্ছে না। কর্তারা একদল লোকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন আর একদল লোক...ভয় দেখিয়ে তাদের অন্ধ ক'রে রেখেছেন...হাত-পা বেঁধে নিঙড়ে শুষে নিচ্ছেন তাদের রক্ত...এক দলকে দিয়ে আর একদলকে করছেন আঘাত। মানুষকে আজ তারা পরিণত করেছেন অস্ত্রে, আর তার নাম দিয়েছেন সভ্যতা।

তারপর কণ্ঠ আরও দৃঢ় ক'রে বললো, এ পাপ, মা! লক্ষ লক্ষ মানুষকে, লক্ষ লক্ষ আত্মাকে হত্যা করার জঘন্য পাপ। হাঁ, আত্মাকে হত্যা করে তারা। তাদের আমাদের তফাৎ দেখ, মা। এণ্ড্রি না বুঝে খুন ক'রেও কেমন বিষণ্ণ, লজ্জিত; অস্থির হয়ে পড়েছে। আর তারা হাজার হাজার খুন ক'রে যাবে শান্তভাবে—একটু হাত কাঁপবে না, দয়া হবে না, প্রাণ শিউরে উঠবে না। তারা খুন করবে আমাদের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে। কেন জানো, মা? তারা সবাইকে—সমস্ত-কিছুকে টুঁটি টিপে ধ'রে মারে শুধু ওদের বাগান-বাড়ি, আসবাব-পত্র, সোনা রূপা কোম্পানীর কাগজ এবং লোককে দাবিয়ে রাখবার যত-কিছু সাজ-সরঞ্জাম, নিরাপদ রাখতে। ওরা খুন করে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে নয়—

ওদের সম্পত্তি বাঁচিয়ে রাখতে।···এই অন্যায়, এই অপমান, এই নোঙরামি···এই-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমরা যে সত্য নিয়ে লড়াই করছি তা' কত বড়, কত গৌরবময়।

বাইরে লোকের পায়ের শব্দ হ'ল। দু'জনে চমকে চাইলেন, পুলিস নয় তো!

সতেরো

দোর খুলে ঢুকলো রাইবিন।

রাইবিন সেই শহর ছেড়ে বেরুলো সত্যপ্রচারে—আড্ডা গাড়লো গিয়ে এডিলজেভ ব'লে এক গ্রামে। যাবার সময় সে মেলাই গরম গরম বই ও ইস্তাহার নিয়ে গিয়েছিল,—তাই দিয়ে সে সত্য প্রচার করতো। বইগুলোর বেশ চাহিদা ছিল। আরো বইয়ের দরকার বলে রাইবিন ইয়াফিম ব'লে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে শহরে এসেছে।

পেভেল রাইবিনকে সাদরে অভ্যর্থনা করলো।

রাইবিন সেই ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীই আছে। কর্তাদের ওপর, বুর্জোয়াদের ওপর আজো সে তেমনি চটা। কথাপ্রসঙ্গে বললো, আমার বেশ সুবিধা আছে, নিষিদ্ধ বই ছড়াবো, আর পুলিস টের পেলে ধরবে ও অঞ্চলের দু'জন শিক্ষককে, আমায় সন্দেহ করতে পারবেনা।

পেভেল ব'ললো, কিন্তু এটাতো উচিত নয়, রাইবিন।

কোন্‌টা?

তুমি কাজ করবে, আর তার দুঃখ ভোগ করবে অন্যে!

রাইবিন জবাব দিলো, তুমি ভুল বুঝেছো, পেভেল! প্রথমত, শিক্ষকরা বুর্জোয়া, তাদের কোনো ভয় নেই। কর্তারা শাস্তি দেবেন যে-সব পল্লিবাসীর কাছে বই পাবেন, তাদেরই। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের বইয়েতে কি নিষিদ্ধ কথা কিছু নেই? আছে, তবে তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা, আমার বইয়ের মতো সোজা খোলাখুলি লেখা নয়। তৃতীয়ত, বুর্জোয়াদের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে চলতে চাই না আমি। পায়ে যে হাঁটছে তার কি সাজে ঘোড়-সওয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা? সত্য কথা বলতে কি, ওদের এই গায়ে-পড়ে দেশের কাজ করাটাকে আমি দস্তুর-মতো সন্দেহ করি। ওদের উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই খুব সাধু নয়। তাই ওরা বিপদে পড়লে আমি দুঃখিত হব না। সাধারণ পল্লিবাসীর ওপর অবশ্য এ রকমটা করতুম না।

মা বললেন, কিন্তু কর্তাদের মধ্যেও এমন দু'চারজন আছেন, যারা আমাদের জন্য প্রাণ দেন।

রাইবিন বললো, তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশির ভাগের সঙ্গেই আমাদের অহি-নকুল সম্পর্ক। আমরা 'হাঁ' বললে, ওরা বলবে 'না' আর আমরা 'না' বললে, ওদের 'হাঁ' বলা-ই চাই—আমার পেট ভরে খেলে ওদের ঘুম হয় না, এই ওরা। পাঁচ বছর ধরে আমি শহরে শহরে, কারখানায় কারখানায় ঘুরেছি, তারপরে গেলুম গ্রামে—কিন্তু গিয়ে যা দেখলুম, তাতে বুঝলুম, আর এমন করে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তোমরা শহরে থাকো, ক্ষুধা কি জানো না, অত্যাচার কি প্রত্যক্ষ কর না। কিন্তু গ্রামে সমস্ত জীবন ক্ষুধা মানুষের সঙ্গী হয় ছায়ার মতো—ক্ষুধা মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করে—তার আকৃতি থেকে মানুষের ছাপ লোপ ক'রে

দেয়। মানুষতো গ্রামে বেঁচে নেই, তারা অপরিহার্য অভাবে প'চে মরছে, আর তাদেরই চারদিকে কর্তারা শ্যেন-দৃষ্টি বিস্তার করে বসে আছে—একটি টুকরোও যাতে তাদের মুখে এসে না পড়ে—পড়লে, যাতে তাদের মুখে ঘুসি মেরে তারা তা ছিনিয়ে নিতে পারে।

রাইবিন চারদিকে চাইলো, তারপর পেভেলের দিকে ঘুরে পড়ে টেবিলের ওপর হাত রেখে বলতে লাগলো, এমনি জীবন দেখে গা আমার রি রি করে উঠলো—ইচ্ছে হ'ল ছুটে শহরে চলে যাই। কিন্তু গেলুম না, গ্রামেই রইলুম। কর্তাদের চর্ব্যচোষ্য যোগাবার জন্য নয়, তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। মানুষের ওপর অনুষ্ঠিত এই অন্যায়, এই অত্যাচারের জ্বালার বাহন আমি—শানিত ছুরিকার মতো এই অন্যায় অহর্নিশ আমার প্রাণে কেটে কেটে বসছে···আমায় সাহায্য কর পেভেল—এমন বই দাও, যা' প'ড়ে মানুষ আর স্থির থাকতে পারবে না—তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে, এমন সত্য আজ তাদের শিক্ষা দাও যা গ্রামকে উত্তপ্ত ক'রে তুলবে, যা' শুনে মানুষ মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে।···

তারপর হাত তুলে প্রত্যেকটা কথার ওপর জোর দিয়ে বলতে লাগলো, মৃত্যু আজ শোধ করুক মৃত্যুর ঋণ—মৃত্যু আজ উদ্বুদ্ধ করুক নব-জীবন। সহস্র সহস্র প্রাণ আজ উৎসর্গীকৃত হ'ক বিশ্বমানবকে নবভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য।···এই চাই। শুধু মরা নয়—সে তো সোজা। চাই নব জীবন, চাই বিপ্লব···

মা চা নিয়ে এলেন। পেভেল বললো, বেশতো, মাল-মশলা দাও, পাড়াগাঁর জন্যও আমরা একটা কাগজ বের করছি।

দেবো। যতদূরসম্ভব সোজা ভাষায় লিখো···একটা ছোট ছেলেও যেন বুঝতে পারে।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, আহা, যদি ইহুদী হতুম আমি! খৃস্টান সাধুরা অপদার্থ…ইহুদী প্রফেটরা এমন ভাষায় কথা কইতে পারতো, যা শুনলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তারা গির্জায় বিশ্বাসী ছিল না, ছিল আত্ম-বিশ্বাসী; তাদের ভগবান ছিল তাদেরই অন্তরে। তাই তারা মানতো একমাত্র অন্তরের নীতি। মানুষ আইনের দাস নয়, সে মানবে তার অন্তরকে। তার অন্তরে সমস্ত সত্য নিহিত। সে পুলিসের দারোগাও নয়, গোলামও নয়—সে মানুষ, যার সমস্ত আইন তার মধ্যে।

রান্নাঘরের দোর খুলে এক যুবক এসে ঢুকলো। এই ইয়াফিম। রাইবিন তাকে পরিচিত করে দিলো পেভেলের সঙ্গে। তারপর বই বাছা শুরু হল। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইয়াফিম বললো, মেলাই বই দেখছি আপনাদের, কিন্তু পড়বার ফুরসুৎ বোধ হয় কম, গ্রামে কিন্তু পড়ার সময় প্রচুর।

কিন্তু ইচ্ছে বোধ হয় কম?—পেভেল বললো।

কম? কম কেন হবে। যথেষ্ট ইচ্ছে তাদের। দিনকাল কেমন পড়েছে জানেন তো! ভাববার শক্তি হারিয়ে যে নিশ্চিন্ত থাকতে চায়, তার মৃত্যু অবধারিত। মানুষ তো আর মরতে চায় না, তাই ভাবতে শুরু করেছে। তাইতো বই'র চাহিদা…ভূতত্ত্ব—এটা কি?

পেভেল ভূ-তত্ত্ব কি বুঝিয়ে বলতে ইয়াফিম বললো, জমির উদ্ভব হ'ল কি করে চাষীরা তা তত জানতে চায় না, যত জানতে চায় জমি কি ক'রে তাদের বেহাত হ'য়ে জমিদারের হাতে গেলো। পৃথিবীটা স্থির থাকুক, ঘুরুক, দাঁড়িতে ঝুলুক, যা' খুশি হ'ক—কোনো আপত্তি নেই তাদের—তারা শুধু চায় খাবার।

এমনিভাবে বই বাছাই চলতে লাগলো। পেভেল ইয়াফিমকে জিগ্যেস করলো, তোমার নিজের জমি আছে?

হাঁ, ছিল, কিন্তু জমি চ'ষে আর রুটি মেলে না, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি, এবার সৈন্যদলে ঢুকবো। কাকা বারণ করেন, বলেন, সৈন্যদের কাজ তো লোকদের ধরে ঠেঙানো। কিন্তু আমি যাবো, বহুযুগ ধরে মানুষদের সৈন্যের সাজে সাজিয়ে রাখা হয়েছে—আজ তার অবসান করবার দিন এসেছে। কি বলেন?

দিন এসেছে সত্য, কিন্তু কাজটা শক্ত। সৈনিকদের কি বলতে হবে, কেমন ক'রে বলতে হবে, তা জানা চাই।

তা জানবো, শিখবো।

কর্তারা টের পেলে গুলি ক'রে মারবে।

তা' জানি। জানি যে তারা কোনো দয়া দেখাবে না। কিন্তু লোক তো জাগবে। আর এই জাগরণই তো বিদ্রোহ। নয় কি?

এবার ওঠা যাক।

রাইবিন, ইয়াফিম উঠে পড়লো। বইগুলো হাতে নিয়ে ইয়াফিম বললো, আজকাল এ-ই আমাদের আঁধারের আলো।

তারা চ'লে গেলে পেভেল এণ্ড্রিকে বলে, রাইবিনের তেজ আছে দেখছি।

এণ্ড্রি বললো, হাঁ, আমিও তা' লক্ষ্য করেছি।...চাষীদের মন আজ বিষিয়ে উঠেছে। ওরা যখন জাগবে, ওরা যখন নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে, সমস্ত জিনিস ওরা ওলট-পালট ক'রে দেবে। ওরা চায় মুক্তি, জমি—তাই সমস্ত-কিছু প্রতিষ্ঠানকে ওরা ভেঙে-চুরে পুড়িয়ে ভূমিসাৎ

করে দেবে…মুষ্টি-মুষ্টি ভস্মের মধ্যে বিলুপ্ত হ'বে তাদের ওপর যুগ-যুগান্ত ধ'রে অনুষ্ঠিত অন্যায়।

পেভেল বললো, তারপর তারা লাগবে আমাদের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

না পেভেল। আমরা তাদের দলে টানতে পারব। বোঝাতে পারব যে, মজুর আর চাষী একই ব্যথার ব্যথী, একই পথের পথিক। আমি জানি, তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করবে, আমাদের দলে যোগ দেবে।

—আঠারো—

দিন কয়েক পরে নিকোলাই এসে হাজির হ'লো। বললো, ব্যাটাকে আমিই সাবাড় করবো মনে করেছিলুম, কিন্তু মাঝখান থেকে কে এসে মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে।

পেভেল স্নেহভরা কণ্ঠে বললো, চুপ চুপ, যা-তা বলো না!

নিকোলাই বললো, কি করবো আমি। দুনিয়ার কোথায় আমার স্থান—কিছুই বুঝি না। চোখে সব দেখি, মানুষের ওপর যে অন্যায় হচ্ছে, তা' মর্মে মর্মে অনুভব করি; কিন্তু তা খুলে বলার ভাষা পাই না।…বন্ধু, আমায় কাজ দাও…একটা কঠিন কাজ দাও…এই অন্ধ, অকেজো, জীবন আর সহ্য করতে পাচ্ছি না আমি…তোমরা এক মহান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছো, সে কাজ ক্রমশ এগোচ্ছে, দেখছি…অথচ আমি দূরে দাঁড়িয়ে। কাঠ তুলি, তক্তা ফাঁড়ি…অসহ্য। আমায় একটা শক্ত কাজ দাও, ভাই।

পেভেল বললো, দেবো।

এণ্ড্রি ব'লে উঠলো, চাষীদের জন্য আমরা একখানা কাগজ বের কচ্ছি। তুমি টাইপ সাজানো শিখে তার কম্পোজিটারের কাজ কর। আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো।

নিকোলাই বললো; তা' যদি দাও, তাহ'লে এই ছুরিখানা তোমায় উপহার দেবো।

এণ্ড্রি হেসে উঠলো, ছুরি! ছুরি নিয়ে কি করব?

কেন,—ভালো ছুরি, দেখো না!

আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন চল, বেড়িয়ে আসি।

তিন জনে বেড়াতে বেরিয়ে গেলো।

দিন ব'য়ে চললো এম্‌নি ক'রে। পয়লা মে'র উৎসবের আয়োজনও চলতে লাগলো পূর্ণ মাত্রায়। পথে, ঘাটে, কারখানায়, দেয়ালে, থানার গায়ে, লাল ইস্তাহারের ছড়াছড়ি। পেভেল এণ্ড্রি দিন-রাত সমানে খাটে। মার ওপরও বহুৎ কাজের ভার থাকে। মা সারাদিন তাই নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান। স্পাইতে পল্লি ভ'রে গেছে কিন্তু কাউকে হাতে-কলমে ধরতে পাচ্ছেনা। পুলিসদের শক্তিহীনতা দেখে তরুণদের আশা এবং উৎসাহ বাড়ছে।

তারপর এলো সেই পয়লা মে।

মা সব্বার আগে জেগে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চাপালেন। জল ফুটে গেলো, কিন্তু তিনি ছেলেদের ডাকলেন না। আজ ওরা একটু ঘুমোক, এ ক'দিন অতো খেটেছে।

কারখানার পয়লা বাঁশি বেজে গেলো। তখনো তাদের ঘুম ভাঙলো না। দ্বিতীয় বাঁশি বাজাতে এণ্ড্রি উঠে পেভেলকেও ডেকে তুললো। তারপর চা খেতে গেলো মায়ের কাছে।

মা এণ্ড্রিকে একান্তে বললেন, এণ্ড্রি, ওর কাছে-কাছে থাকিস্, বাবা!

নিশ্চয়ই। যতক্ষণ সম্ভব, থাকবো।

পেভেল বললো, চুপি-চুপি কি কথা হ'চ্ছে তোমাদের?

কিছু না। মা বলছিলেন, হাত-মুখ বেশ ক'রে ধুতে, যাতে মেয়েরা আমাদের দিকে চেয়ে আর না চোখ ফেরাতে পারে। ব'লে এণ্ড্রি হাত-মুখ ধুতে চ'লে গেলো।

পেভেল গাইতে লাগলো মৃদুস্বরে, ওঠো, জাগো, মজুরদল…

মা বললেন, শোভা-যাত্রার বন্দোবস্ত করলে পারতিস এখন।

বন্দোবস্ত সবই ঠিক হ'য়ে আছে, মা।

যদি আমরা ধরা পড়ি আইভানোভিচ এসে যা' করার করবে। সে-ই তোমার সব রকমে সাহায্য করবে।

বেশ…মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন।

ফেদিয়া মেজিন যৌবনোচিত উৎসাহ এবং আনন্দ-দীপ্ত হ'য়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, শুরু হ'য়ে গেছে। সবাই রাস্তায় বেরিয়েছে। নিকোলাই, গুসেভ, শ্যামোয়লোভ কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। বেশির ভাগ লোক কারখানা ছেড়ে বাড়ি চ'লে এসেছে। চলো, আমরাও যাই, এই ঠিক সময়। দশটা বেজে গেছে।

যাচ্ছি।

দেখবে, মধ্যাহ্ন-ভোজের পর সবাই জেগে উঠবে।

মেজিন, এণ্ড্রি, পেভেল, মা—চারজনেই বেরিয়ে পড়লেন পথে। দোরে, জানালায়, পথে, সর্বত্র লোকের ভিড় এবং কোলাহল। সবাই এণ্ড্রি পেভেলের দিকে চাইছে, সবাই তাদের অভিনন্দিত করছে।

এক জায়গায় একজন চিৎকার ক'রে উঠল, পুলিস ধরবে ওদের; তা' হ'লেই সব শেষ।

আর একজনে জবাব দিলো, ধরুক, তাতে কি হয়েছে!

আর একটু দূরে জানালা দিয়ে ভেসে আসছে এক রমণীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর···একবার ভেবে দেখ, তুমি কি একা?—একা নও। ওরা সব অবিবাহিত। ওদের কি···

যোশীমভের পা কবে কাটা পড়েছিল ব'লে কারখানা থেকে সে মাসোয়ারা পেতো। তার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে সে জানালা দিয়ে মুখ বের ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, পেভেল, পাজি, তোর মুণ্ডুটা ওরা ছিঁড়ে না নেয় তো কি বলেছি!

মা শিউরে উঠলেন, ক্রুদ্ধ হলেন। তারা কিন্তু কিছুমাত্র গায়ে না মেখে দিব্যি সাত-পাঁচ গল্প করতে করতে চল্‌লো। মিরোনোভ ব'লে এক মজুর এসে তাদের বাধা দিয়ে বললো, শুন্‌চি নাকি তোমরা দাঙ্গা করতে যাচ্ছ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জানালা ভাঙতে যাচ্ছো?

পেভেল বললো, সে কি! আমরা কি মাতাল?

এণ্ড্রি বললো, আমরা যাচ্ছি শুধু নিশান নিয়ে শোভাযাত্রা বের করতে, আর মজুরদের গান গাইতে। সে গান তোমরাও শুনতে পাবে। সেতো শুধু গান নয়···সে মজুরদের মন্ত্র, মজুরদের মতবাদ!

মিরোনোভ বললো, সে সব আমি জানি। আমি তোমাদের লেখা পড়ি কিনা...তারপর মা, তুমিও বুঝি বিদ্রোহ করতে চলেছো।

হাঁ। মৃত্যু যদি আসে, আমি সত্যের সঙ্গে গলাগলি হ'য়ে পথ চলবো।

ওরা দেখছি নেহাৎ মিথ্যে বলেনি যে, তুমিই কারখানায় নিষিদ্ধ ইস্তাহার ছড়াও।

কারা বলেছে? পেভেল জিগ্যেস করলো।

লোকেরা! আচ্ছা, আসি তাহ'লে।...

মিয়োনোভ চ'লে যেতে পেভেল বললো, তুমিও দেখছি, মা, জেলে যাবে।

যাই যাবো—মা ধীরে ধীরে বলেন।

সূর্য ওপরে উঠলো। বেলা বাড়ছে। লোকের উত্তেজনাও বাড়ছে। বড় রাস্তার গায়ে এক গলির মাথায় শ'খানেক লোকের ভিড়। তার মধ্য দিয়ে আসছে নিকোলাইর গলা......মুগুরের ঘায়ের মতো...'ওরা আমাদের রক্ত নিঙরে নিচ্ছে, ফল থেকে রস যেমন ক'রে নেওয়া হয়।...'

সত্যি কথা—একযোগে অনেকগুলি কণ্ঠ বেজে উঠলো।

এণ্ড্রি বললো, সাবাস, নিকোলাই! বলেই সে তার কর্কস্ক্রুর মতো দেহটা ভিড়ের মধ্যে গলিয়ে দিলো! পরক্ষণেই বেজে উঠলো তার গলা, বন্ধুগণ, ওরা বলে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন জাতি...ইহুদী, জার্মান, ইংরেজ, তাতার...কিন্তু আমি তা' বিশ্বাস করিনে। দু'টি মাত্র পরস্পর-বিদ্বেষী জাত আছে দুনিয়ায়—ধনী এবং দরিদ্র। ধনীদের পোশাক বিভিন্ন হ'তে পারে, ভাষা স্বতন্ত্র হ'তে পারে, দেশ হিসাবে তারা ফরাসী, জার্মান অথবা ইংরেজ হ'তে পারে, কিন্তু মজুরদের সঙ্গে কারবারের বেলা তারা সবাই একজাত, সবাই তাতার। নিপাত যাক এই ধনীর দল!

শ্রোতাদের মধ্যে একটা উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেলো।

এণ্ড্রি বলতে লাগলো, এবার চাও মজুরদের দিকে। ফরাসী মজুর,

জার্মান মজুর, ইংরেজ মজুর—সবাই কাটাচ্ছে আমাদের রুশ-মজুরের মতোই কুকুরের জীবন।...

ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এণ্ড্রি গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, বিদেশের মজুররা আজ এই সোজা সত্য বুঝতে পেরেছে। আজ পয়লা মে'র এই উজ্জ্বল দিবসে তারা আবদ্ধ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে; কাজ ছেড়ে, রাস্তায় এসে দলে দলে মিলিত হয়ে তারা আজ পরস্পরকে দেখছে, আর হিসাব নিচ্ছে তাদের বিপুল শক্তির। এইদিনে মজুরদের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে একটি প্রাণ,—মজুরদের যে কী বিপুল শক্তি, এই জ্ঞানে সকল প্রাণ আলোকিত; সমস্ত হৃদয়ে আজ বন্ধুত্বের স্পন্দন; সঙ্গীদের সুখের জন্য, তাদের মুক্তি এবং সত্য লাভের জন্য যে যুদ্ধ, তাতে আত্মদান করতে সবাই আজ প্রস্তুত।...

কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পুলিস!

—উনিশ—

চারজন অশ্বারোহী পুলিস 'ভাগো' 'ভাগো' ব'লে ছুটে এলো। পলকে মজুররা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো। এণ্ড্রি তখনও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ঘোড়া তার গায়ে এসে পড়ার উপক্রম দেখে সে স'রে দাঁড়ালো, আর তক্ষুণি মা তাকে টেনে নিলেন, তুমি না কথা দিয়েছো, পেভেলের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে!

ঘাট্ হ'য়ে গেছে, মা, তাই থাকবো।

আবার চলতে লাগলো তারা।

গির্জার বাগানে এসে থামলো। চার-পাঁচশো লোকের ভিড়। ছেলে মেয়ে, বুড়ো ছুটোছুটি করছে চারদিকে প্রজাপতির মতো আনন্দে। জনসমুদ্র দুলছে একবার এদিকে, একবার ওদিকে। ভিড়ের মধ্যে শিজভের গলা,…না, আমাদের ছেলেদের আমরা ত্যাগ করবনা। জ্ঞানে ওরা আমাদের শ্রেষ্ঠ, সাহসে ওরা আমাদের শ্রেষ্ঠ। জলাভূমির জন্য অন্যায় কর হ'তে কারা আমাদের রক্ষা করেছে?—ওরা! এ কথাটা ভুললে চলবে না। এ ক'রে ওরা জেলে গেছে, কিন্তু সুফল ভোগ করছি আমরা—আমরা সকলে।…

বাঁশি বেজে উঠলো, জনতার কলরবকে ডুবিয়ে দিয়ে। সবাই চম্‌কে উঠলো। যারা ব'সে ছিল, উঠে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত— সব মৃত্যুর মতো নীরব, নিথর। সবারই সতর্ক-দৃষ্টি, মলিন-মুখ। তার মধ্যে আচম্‌কা ধ্বনিত হ'ল পেভেলের দৃঢ় কণ্ঠ, বন্ধুগণ!…

মা'র চোখের সাম্‌নে জ্বলে উঠলো যেন আগুনের দীপ্তশিখা…সমগ্র শক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজের দেহটা পেভেলের পেছনে এনে দাঁড় করালেন। সকলের দৃষ্টি ফিরলো পেভেলের দিকে…চুম্বক যেন টানছে লৌহ-শলাকাকে।

বন্ধুগণ! ভাইগণ! আজ লগ্ন উপস্থিত…আজ বর্জন করতে হ'বে আমাদের এই জীবন, এই লোভ, ঈর্ষা, অন্ধকারের জীবন, এই হিংসা মিথ্যা অপবিত্র জীবন,…এই জীবন—যেখানে আমাদের কোন স্থান নেই, যেখানে আমরা মানুষ ব'লে পরিগণিত নই।…

পেভেল থামলো, জনতা নিঃশব্দে তার দিকে আরো চেপে দাঁড়ালো। মা ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন…কী গর্বপূর্ণ সাহস-দীপ্ত জ্বলন্ত ছেলের চোখ!

…বন্ধুগণ, আমরা সংকল্প করেছি, মুক্তকণ্ঠে প্রচার করব আমরা কে! …আমরা আজ নিশান তুলে ধরব আকাশে…যুক্তির নিশান, সত্যের নিশান, স্বাধীনতার নিশান! এই সেই নিশান।

জনতার মধ্য দিয়ে মজুরদের লাল ঝাণ্ডা লাল পাখির মতোই ঊর্ধ্বে উত্থিত হ'ল পেভেলের হাতে। তারপর হঠাৎ তা' নুয়ে পড়তেই দশ বারোখানা হাত তা' ধ'রে ফেললো…তার মধ্যে মাও ছিলেন। পেভেল জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো, মজুরের জয়!

শত শত কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি হ'ল।

সোশ্যাল-ডিমোক্রেটিক মজুরদলের জয়! সকল দেশের সকল মজুরের জয়!

জনতা যেন উত্তেজনায় টগবগ্ ক'রে ফুটছে। নিশানের অর্থ যারা বোঝে, তারা ভিড় ঠেলে তার দিকে এগোয়। মা পেভেলের হাত চেপে ধ'রে আনন্দে, আবেগে কাঁপতে থাকেন। নিকোলাইও পেভেলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

সকল কোলাহল ছাপিয়ে এণ্ড্রির কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল, বন্ধুগণ, আমরা আজ এক পবিত্র জয়-যাত্রার সূচনা করলুম…নবীন এক দেবতার নামে। আমাদের সে দেবতা হচ্ছে—সত্য, আলোক, যুক্তি, মঙ্গল। এই পবিত্র জয়-যাত্রার পথ যেমন দীর্ঘ, তেমনি কণ্টক-সংকুল। আমাদের লক্ষ্য দূরে, অতি দূরে। কাঁটার মুকুট আমাদের সামনে নাচচে, আমাদের অপেক্ষায়। যারা সত্যের শক্তিতে বিশ্বাসী নও, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সত্য রক্ষা করার সাহস যাদের নেই, আত্ম-শক্তিতে যারা বিশ্বাস করে না, দুঃখের নামে যারা শঙ্কিত হও—তারা তফাতে সরে দাঁড়াও। আমরা তাদেরি আহ্বান করছি, যারা বিশ্বাস করে, জয়ী আমরা হবোই।

মা

আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ, তারা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাক···তারা চিরদিন পাবে শুধু দুঃখ। সঙ্গীদল, সজ্জিত হ'য়ে দাঁড়াও, বলো, জয়যুক্ত হ'ক এই পয়লা মে···জয়যুক্ত হ'ক মুক্ত মজুর সংঘের এই উৎসব-তিথি।

হাজার হাজার কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, জনতা চেপে দাঁড়ালো। পেভেল লাল-নিশান তুলে ধরলো···তাতে সূর্যের রক্ত-বর্ণ কিরণ এসে ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলতে লাগলো। ফেদিয়া মেজিন চেঁচিয়ে উঠলো, পুরাণো জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে পড় যাত্রীদল।···

যাত্রা শুরু হ'ল। সবার আগে নিশান হাতে পেভেল। তারপরেই অন্যান্য নায়কদল। সবাই মজুরদের বিজয়-সংগীত গাইতে গাইতে চলেছে!

ওঠো, জাগো, মজুরদল!
ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল।

পথের দু'ধার থেকে দলে দলে লোক সোল্লাসে নিশানের দিকে ছুটে আসে, ভিড়ে মিশে যায়, তারপর বিপ্লব-সংগীতে গগন আলোড়িত ক'রে অগ্রসর হয়।

মা এ গান এর আগেও শুনেছেন বহুবার। কিন্তু আজ যেন প্রথম এর সুর তাঁর প্রাণে গিয়ে লাগলো,—

দুঃখী সঙ্গী কাঁদিছে হায়!
সেথা যেতে হবে···আয়রে আয়···

জনতা গানের সুরে মেতে উঠতে লাগলো।

এক মা যাত্রী ছেলেকে বেঁধে রাখার চেষ্টায় কেঁদে উঠছেন, মিতিয়া, কোথায় যাচ্ছিস, বাবা!

মা তাকে বললেন, ছি বোন, যেতে দাও, ভয় পেয়োনা, ভয় কি? আমিও প্রথম প্রথম ভয় পেতুম; কিন্তু এখন ঐ দেখ, আমার ছেলে সবার আগে—নিশান হাতে—ঐ···

শঙ্কিতা মাতার কানে তা গেলো না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, ডাকাতরা করছে কি? কোথায় যাচ্ছে? সৈন্যেরা যে ওদের মেরে ফেলবে গো!···

মা বললেন, অধীর হয়োনা বোন! মহৎ কাজের ধরণই এই! এই যীশুখৃস্ট···তিনিই কি যীশুখৃস্ট হ'তে পারতেন, যদি না শত সহস্র লোক তাঁর জন্য মরতো?

গানের সুর তখন আরও চ'ড়ে গেছে—

জারের যখন সৈন্য চাই
ছেলে দাও, নইলে রক্ষা নাই···

শিজভ জোর গলায় ব'লে উঠলো, সাবাস্ জোয়ান, ভয়ডর কিছু নেই তোমাদের।···আমার ছেলে, সে যদি আজ বেঁচে থাকতো! কারখানা তাকে খুন করেছে। হাঁ, খুন করেছে।

মার বুকের রক্ত দ্রুততালে নেচে উঠলো। কিন্তু ভিড়ের অসম্ভব চাপে তিনি কোণঠ্যাসা হ'য়ে এক দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন, জন-স্রোতের বিচিত্র গতি। হাজারে হাজারে উন্মত্ত লোক···মনে হয় যেন একটা বৃহৎ কাঁসার জয় ঢাকের প্রলয়ংকর ধ্বনি তাদের মাতিয়ে তুলেছে···কেউ মাতছে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায়, কেউ মাতছে একটা অস্পষ্ট আনন্দে, একটা নতুন-কিছুর সম্ভাবনায়, একটা জলন্ত কৌতুহলে! বহু বছরের পুঞ্জীভূত কণ্টকিত ব্যথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেন আজ সংগীতের মধ্য দিয়ে বেরুচ্ছে।

সবাই ঊর্ধ্বে নিশানের দিকে চেয়ে পথ চলেছে, সবাই চিৎকার করছে, কিছু-না-কিছু বলছে, কিন্তু সমস্ত কণ্ঠ ডুবিয়ে বেজে উঠছে-সেই গান…নতুন গান…এ সে পুরাণো দুঃখ-করুণ সুর নয়, এ সে অভাব-ক্লিষ্ট ভয়াতুর ব্যক্তিত্বহীন নিরানন্দ নিঃসঙ্গ নিশি-যাত্রীর আর্ত-বিলাপ নয়, এ সে রুদ্ধ-শক্তির অভিব্যক্তি বেদনা নয়।…ভালোমন্দ দুই-ই অবিভেদে নাশ করে যে—এ সে ক্রুদ্ধ সাহসের উত্তেজিত সুর নয়! এ সে পশুশক্তি নয়, যা শুধু মুক্তির জন্যই মুক্তি চাই ব'লে চিৎকার করে, যা অন্যায়ের প্রতিহিংসাবশে শুধু ধ্বংসই করে চলে, সৃষ্টি করতে পারে না। দাসত্ব-দূষিত, পুরাণো জগতের কোন-কিছু নেই এতে। সোজা… সরল…সুদৃঢ়…শান্ত এ সংগীত। মানুষকে এ মাতিয়ে নিয়ে চলে দীর্ঘ অন্তহীন পথে, সুদূর সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভিমুখে। পথের দুঃখ এ গোপন করে না। এর স্থির অচঞ্চল আগুনে জ্বলে পুড়ে গলে যায় মানুষের স্তূপীকৃত দুঃখ-বেদনা, তার চিরাভ্যস্ত মলিন সংস্কার-ভার, নব-যুগের সম্বন্ধে তার মিথ্যা আশঙ্কা।

সেই বিশাল জন-সমুদ্র এই সংগীতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এগিয়ে চললো। পেছনে সংশয়ী বিরুদ্ধদল। এ অভিনয়ের কখন কোথায় অবসান হ'বে, তা যেন তারা আগে থেকেই জানে। মা শুনলেন তাদের কথা।

একদল সৈন্য স্কুলের কাছে, আর একদল কারখানার কাছে।

গভর্ণর এসে পড়েছে।

তাই নাকি?

হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখলুম তাঁকে।

একজন তা' শুনে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, আমাদের ওরা কম

ডরায় মনে করেছো? এইতো দেখো—গভর্ণর স্বয়ং সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন।...

বিক্ষুব্ধের কথা মার ভালো লাগছিল না। ভিড় ঠেলে তিনি সামনে এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ মনে হল, জন-স্রোতের অগ্রভাগ যেন কি একটা কঠিন জিনিসের ওপর ঘা খেয়ে পেছনে টলে পড়ছে···জনতার মধ্য দিয়ে উঠছে একটা মৃদু কিন্তু আতঙ্ক-ভরা গুঞ্জন। গানের সুরটাও একবার কেঁপে উঠলো, তারপর ধ্বনিত হ'ল আরো উচ্চ এবং দ্রুত তালে। কিন্তু আবার গানের তাল ভঙ্গ হ'ল···গায়কদল একে একে সরে পড়তে লাগলো দল থেকে···এদিকে ওদিকে দু'চারটি কণ্ঠ গানকে বাঁচিয়ে রাখার দুরূহ চেষ্টায় চেঁচাতে লাগলো।

"ওঠো, জাগো, মজুরদল,
ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল···"

শোভা-যাত্রার সামনে কি ব্যাপার হচ্ছে তা' চোখে দেখতে না পেলেও মা যেন ভাবতে পারলেন। দ্রুতপদে তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললেন।

—কুড়ি—

এগিয়ে পেভেলের গলা পেলেন।

···বন্ধুগণ, সৈনিকেরাও আমাদের মতোই মানুষ। তারা আমাদের মারবে না। কেন মারবে? সকলের হিতার্থে আমরা সত্য প্রচার করি ব'লে? এ সত্য ঐ সৈনিকদেরও হিতকর। এখন ওরা একথা বুঝছে না

বটে, কিন্তু দিন আসছে যখন ওরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, যখন ওরা সমবেত হবে—ঐ ডাকাত এবং খুনীদের পতাকা—যে পতাকাকে ঐ মিথ্যাবাদী পশুদল গৌরবের এবং সম্মানের পতাকা ব'লে অভিবাদন করতে ওদের বাধ্য করে—তার তলে নয়, আমাদের এই মুক্তির এবং মঙ্গলের পতাকা তলে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এ পতাকা নিয়ে, যাতে তারা সত্বর এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে। এগোও, বন্ধুগণ, দৃঢ়পদে এগিয়ে চলো।

পেভেলের কণ্ঠ দৃঢ় এবং স্পষ্ট। কিন্তু জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল। একে একে ডাইনে বাঁয়ে, বাড়ির দিকে, বেড়ার পাশে ভেগে যেতে লাগলো লোক। জনতার আকৃতি হ'য়ে পড়লো গোঁজের মতো, আর তার আগায় নিশান হাতে পেভেল।

পথের শেষে বাগানের বাইরে যাবার পথ বন্ধ ক'রে বেয়োনেটধারী একদল সৈন্য···দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে।

মা আরো এগিয়ে গেলেন।

পেভেল বললো, সঙ্গীগণ, সমস্ত জীবনভোর অগ্রসর হও। আর কোন গতি নেই আমাদের। গাও···

···ওঠো, জাগো, মজুরদল!
ক্ষুধিত মানব যুদ্ধে চল···

নিশানটা আরও উর্ধ্বে উঠে ঢেউ খেলে খেলে সৈন্য-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেলো। মা শিউরে উঠে চোখ বুজলেন। জনতা সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। এগোলো শুধু পেভেল, এণ্ড্রি, শ্যামোয়লোভ ও মেজিন।

মেজিনের কণ্ঠে বেজে উঠলো সংগীতের সুর···"ভীষণ রণে···

ভয়-চকিত মোটা গলা পেছন থেকে গেয়ে উঠলো,

সঁপিলে প্রাণ…

গানের দু'টো চরণ বেরিয়ে এলো দু'টো দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো। জনতা আবার পা বাড়ালো সামনের দিকে…তাদের পদধ্বনি স্পষ্ট শোনা গেলো। গান আবার নতুন, জোরের সঙ্গে নতুনভাবে বেজে উঠলো!

…ভীষণ রণে সঁপিলে প্রাণ

পর তরে দিল আত্মদান…

কে যেন ঠাট্টার সুরে ব'লে উঠলো, আহা হা, ব্যাটারা গান ধরেছে দেখোনা, যেন শ্রাদ্ধ-সংগীত!

আর একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ এলো, ম্যার ব্যাটাদের!

মা বুকে হাত চেপে ধরলেন, চেয়ে দেখলেন, সেই বিরাট জনতা চঞ্চল, সচকিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে চলেছে নিশান হাতে জন বারো লোক—তারাও আবার এক এক ক'রে ছিটকে যাচ্ছে দল থেকে …পায়ের তলার মাটি যেন হঠাৎ তেতে আগুন হয়েছে, এমনি ভাবে। ফেদিয়া গেয়ে উঠলো, …শেষ হবে এ অত্যাচার…

সমবেত সুর ধ্বনিত হল —মানুষ জাগিবে পুনর্বার…

হঠাৎ সুর ভঙ্গ হ'য়ে তীক্ষ্ণ আওয়াজ এলো, সঙিন চালাও।

মুহূর্তমধ্যে সঙিনগুলো একসঙ্গে উর্ধ্বে উত্থিত হ'য়ে সূর্যালোকে ঝলমল ক'রে উঠলো।

মার্চ।

ঐ রে, আসছে, ব'লে একজন খোঁড়া একলাফে রাস্তার একপাশে গিয়ে সরে দাঁড়ালো।

মা নিষ্পলকে চেয়ে রইলেন। সৈন্যদল গোটা রাস্তাটায় ছড়িয়ে প'ড়ে

সঙিন উঁচিয়ে মার্চ করে আসছে—শান্তভাবে। খানিক-দূর এসে তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো।' মা ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন এণ্ড্রি পেভেলের আগে গিয়ে নিজের দীর্ঘ দেহ দিয়ে তাকে আগলে রেখেছে, আর পেভেল তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে—সামনে থেকে স'রে দাঁড়াও। এণ্ড্রি মাথা উঁচু ক'রে মহোৎসাহে গান গাইছে, পেভেল তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, পাশে যাও, নিশান সামনে থাক্।

'ভাগো' ব'লে একজন সামরিক কর্মচারী সজোরে ভূমিতে পদাঘাত ক'রে চক্‌চকে একখানা তলোয়ার খেলাতে লাগলো। তার পেছনে আবার আরও একজন কর্মচারী।

মা যেন শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর বুক ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল। দু'হাতে বুক চেপে তিনি এগোতে লাগলেন—জ্ঞানশূন্য, চিন্তাশূন্য। পেছনে জনতা পাতলা হ'য়ে যাচ্ছে—শীতল বাতাহত পত্রের মতো তারা ঝ'ড়ে পড়ছে দল থেকে।

লাল-নিশানের চারদিকে মজুররা আরও ঘেঁসাঘেঁসি হ'য়ে দাঁড়ালো। সৈনিকেরা সঙিন দিয়ে তাদের তাড়া করতে লাগলো। মা শুনলেন, পেছনে পলাতকদের শঙ্কিত পদশব্দ আর কণ্ঠস্বর—

পালাও, পালাও—

দৌড়ে যাও, মা—

পিছিয়ে এসো, পেভেল।

নিশান ছাড়ো পেভেল, আমায় দাও, আমি লুকিয়ে রাখছি—ব'লে নিকোলাই নিশানটা ধরলো। বারেকের জন্য নিশান পেছনে হেলে পড়লো। পেভেল বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলো, ছাড়ো নিশান।

নিকোলাই হাত টেনে নিলো, যেন হাত তার আগুনে পুড়ে গেছে।

গান থেমে গেলো। সঙ্গীরা পেভেলকে ঘিরে দাঁড়ালো, পেভেল তাদের ঠেলে বেরিয়ে এলো সামনে। অকস্মাৎ সকল কোলাহল থেমে গিয়ে দেখা দিলো এক গভীর নীরবতা।

তারপরেই শোনা গেলো সামরিক কর্মচারীর হুকুম, নিশানটা ছিনিয়ে নাও, লেফটেনেণ্ট!

হুকুমপ্রাপ্ত লেফটেনেণ্ট একলাফে পেভেলের কাছে গিয়ে নিশানটা ধ'রে টানতে লাগলো, ছাড়ো, ছাড়ো।

নিশানটা দু'লে উঠলো, একবার ডাইনে হেললো, একবার বাঁয়ে। তারপর আবার সোজা হ'য়ে উড়তে লাগলো আকাশে।

লেফটেনেণ্ট পিছিয়ে ব'সে পড়লো, নিকোলাই ঘুষি বাগাতে বাগাতে তীরবেগে ছুটে গেলো মার পাশ ঘেঁষে।

ধরো ব্যাটাদের—সামরিক কর্মচারী গর্জন ক'রে উঠলো। তক্ষুণি অনেকগুলো সৈন্য সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙিন উঁচিয়ে। নিশানটা প্রবলভাবে দু'লে উঠে পড়ে গেলো নিচে, আর পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো সৈন্যদের মধ্যে।

একজন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, উহু! মা ক্ষিপ্তা ব্যাঘ্রীর মতো চীৎকার ক'রে উঠলেন, পেভেল! সৈন্যদের মধ্য থেকে স্পষ্ট কণ্ঠে জবাব এলো পেভেলের, মা, বিদায়, বিদায়!

তবে বেঁচে আছে সে!…মনে আছে আমাকে—মার প্রাণে এই দু'টো ভাব স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে এলো এণ্ড্রির কণ্ঠ, মাগো, চললুম।

মা হাত তুলে নাড়ালেন, বুড়ো পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু

হ'য়ে পেভেল-এণ্ড্রিকে দেখতে লাগলেন। এণ্ড্রিকে দেখা যাচ্ছিল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, এণ্ডি, পেভেল!

সৈন্যদলের মধ্য থেকে তারা ধ্বনি করে উঠলো, বন্ধুগণ, বিদায়, বিদায়!

প্রতিধ্বনি হ'লো অজস্র কণ্ঠে—বাড়ির ছাদ থেকে, ঘরের জান্‌লা থেকে, ছত্রভঙ্গ জন-সমুদ্র থেকে।

লেফটেনেন্ট মাকে ঠ্যালা দিয়ে চেঁচাতে লাগলো, ভাগো, ভাগো!

মা চেয়ে দেখলেন, নিশানটা ভেঙে দু'টুকরো হ'য়ে গেছে, একটা টুকরোতে লাল কাপড়টা জড়ানো। নুয়ে সেটা তুলে নিতেই কর্মচারী মার হাত থেকে তা' ছিনিয়ে নিলো এবং একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদর্পে গর্জন ক'রে উঠলো, যাও বলছি এখান থেকে।

সৈন্যদের মধ্য থেকে গানের সুর ভেসে এলো,

'ওঠো, জাগো, মজুরদল।'

চারদিকে সব-কিছু ঘুরছে, দুলছে, কাঁপছে। টেলিগ্রাফের তারের ঝংকারের মতো একটা গাঢ়, ভীতিপ্রদ ধ্বনি উত্থিত হ'চ্ছে। সামরিক কর্মচারিটি সক্রোধে হুংকার ক'রে উঠলো, ব্যাটাদের গান বন্ধ কর, সার্জেণ্ট ক্রেনড্। মা টলতে টলতে গিয়ে সেই ছুঁড়ে-ফেলা নিশান-টুকরো আবার তুলে নিলেন।

মুখ বন্ধ কর ব্যাটাদের।

গানের সুর প্রথমটা এলোমেলো হ'ল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হ'ল।

একজন সৈন্য মাকে পেছন থেকে টেনে মার মুখ ঘুরিয়ে ঠেলে দিলো, বাড়ি যা, বুড়ি।

মার যেন পা আর চলে না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে।

পালা না ডাইনী, বলে একজন তাঁকে এক ঠ্যালায় রাস্তার পাশে সরিয়ে দিলো। মা নিশানের লাঠিটায় ভর দিয়ে চলতে লাগলেন দ্রুত-পদে। পা তাঁর ভেঙে এলো। দেয়াল এবং বেড়া ধ'রে ধ'রে চলছেন। সৈন্যেরা খালি হাঁকছে, যা যা, বুড়ি।

মা চ'লে যাবেন ভাবলেন, কিন্তু অজ্ঞাতে তাঁর পা যেন তাঁকে আবার সামনের দিকে চালিয়ে নিলো। পথ শূন্য। মা দাঁড়ালেন। দূর থেকে অস্পষ্ট শব্দ কানে এলো। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি। রাস্তার মোড়ে একদল লোক উত্তেজিত কণ্ঠে কোলাহল করছে।

ওরা শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্য সঙিনের সামনে বুক পেতে দিচ্ছেনা। —এটা মনে রেখো।

দেখ দিকি ওদের দিকে চেয়ে, সৈন্যরা এগোচ্ছে আর ওরা নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে।

একবার পেভেলের কথা ভাবো।

আর এণ্ড্রি, সেও কি কম?

ঐ কর্মচারী ব্যাটার রকম দেখ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন—ব্যাটা শয়তান।

মার মনের কথা যেন কণ্ঠ দিয়ে ঠেলে বেরোতে চাচ্ছিলো। ঠেলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, প্রিয় বন্ধুগণ,...

সবাই সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ করে দিলো।

একজন বললো, দেখ দেখ, ওঁর হাতে নিশান! আর একজন কঠিন কণ্ঠে বললো, চুপ।

মা হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, বন্ধুগণ, শোনো। মানুষ

তোমরা, একবার প্রাণ খুলে দাঁড়াও। নির্ভয়ে, নিরাতঙ্কে চোখ খুলে চাও। দেখো, আমাদের ছেলেরা আজ জয়-যাত্রায় বেরিয়েছে। আমাদের সন্তান···আমাদের রক্ত আজ সত্যের রণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্তরে তাদের ন্যায়ের দীপ্তি। তারা উন্মুক্ত করছে আজ এক নতুন পথ—সহজ এবং বৃহৎ—সকল মানুষের জন্য, তোমাদের সকলের জন্য, তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য এই পবিত্র ব্রতে আত্মোৎসর্গ করছে তারা। আবাহন করছে এক চির-উজ্জ্বল নবযুগের সূর্যকে। তারা চায় নব-জীবন···সত্য-ন্যায়-মঙ্গল-মণ্ডিত জীবন।

মার প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে, বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে, কণ্ঠ তপ্ত শুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে! অন্তরের অন্তস্তলে উথলে উঠছে এক মহান বিশ্ব-প্লাবী প্রেমের বাণী। জিভ পুড়ে যাচ্ছে—এমনি প্রচণ্ড তার শক্তি, এমনি মুক্ত তার গতি। জনতা নির্বাক হ'য়ে কান পেতে তাঁর কথা শুনছে। এরাও যাতে পেভেলের মতো সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই ভেবেই যেন মা তাদের উত্তেজিত করতে লাগলেন, আমাদের ছেলেরা আজ করাঘাত করছে সুখ-নিকেতনের রুদ্ধ দ্বারে। তাদের অভিযান আমাদের সকলের জন্য। তাদের অভিযান আজ সকল-কিছুর বিরুদ্ধে, যা' দিয়ে মিথ্যাচারী ঈর্ষাপর হিংসাব্রতী শত্রুদল আমাদের ধরে বেঁধে পিষে ফেলছে। হে আমার বন্ধুগণ, তোমাদের—শুধু তোমাদেরই জন্য আজ তরুণের এ বিদ্রোহ। তারা যুদ্ধ করছে সমস্ত মানুষের, সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মজুরের পক্ষ হ'য়ে। তারা মুক্ত করছে এক সত্যোদ্ভাষিত শুভ্রপথ তোমাদেরই চলার জন্য। সেই তোমরা কি আজ তাদের ছেড়ে চ'লে যাবে? ত্যাগ করবে? বর্জন করবে? নির্জন কণ্টক-সংকুল পথে তাদের একা রেখে পালাবে?—না। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মুখ চাও, তাদের গভীর

ভালবাসার কথা স্মরণ কর···নিজেদের দুর্গতির কথা ভাব, ছেলেদের প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস কর। ওরা যে সত্যের বর্তিকা জ্বেলেছে, তা ওদের অন্তরে জ্বলছে, ওরা তাতে পুড়ে মরছে। ওদের বিশ্বাস করো, বন্ধুগণ, ওদের সাহায্য কর···

গভীর উত্তেজনায় রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে মা ঢ'লে পড়লেন। পেছন থেকে একজন তাঁকে ধরে ফেল্‌লো। সবাই যেন গরম হ'য়ে উঠেছে, বলছে, ঠিক কথা, সাঁচ্চা কথা···আমরা কেন ভয়ে পালাবো ছেলেদের ছেড়ে।

বুড়ো শিজভ বুক টান ক'রে দাঁড়িয়ে বললো, আমার ম্যাট্ভি কারখানায় মারা পড়েছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, আমি নিজে তাকে ওদের দলে ভিড়িয়ে দিতুম। আমি নিজে তাকে বলতুম, ম্যাটভি, তুমি যাও ঐ সত্যের রণে, ন্যায়ের রণে।···মা ঠিক কথা বলেছেন—আমাদের ছেলেরা চেয়েছিল জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তি এবং সম্মানের ওপর। আর সেই অপরাধে আমরা তাদের ত্যাগ ক'রে ভীরুর মতো পালিয়ে এসেছি!

জনতা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সবার দৃষ্টি মায়ের ওপর। মার দুঃখ যেন সবার অন্তরকে স্পর্শ করেছে, মার আগুন যেন সবার প্রাণ দীপ্ত ক'রে তুলেছে।

শিজভ মার হাতে সেই নিশান-টুকরো গুঁজে দিয়ে তাঁকে বাড়ি নিয়ে চললো। জনতাও পেছনে পেছনে গেলো। তারপর দু'জনে ঘরে ঢুকতে জনতা যে যার বাড়ি চ'লে গেলো।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

—এক—

সমস্ত দিনটা মা'র চোখের সামনে নাচতে লাগলো সেই শোভা-যাত্রার ছবি! অস্থির, উন্মনা হ'য়ে কথনো তিনি ভাবেন, কথনো বাইরের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পর পুলিস এলো তৃতীয়বার বাড়িতে। মাকে বললো, ছেলেদের মনে রাজভক্তি, ধর্মভাব জাগাতে পারো না? এতো তোমাদের মায়েদেরই দোষ। তারপর ভালো ক'রে খানাতল্লাশী ক'রে চ'লে গেলো। ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে মা খানিকক্ষণ অন্ধকারে ব'সে রইলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন বিছানায়।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, সেই শোভা-যাত্রা…নায়ক পেভেল, এণ্ড্রি… গান চলেছে…পেভেলের দিকে চেয়ে চলেছেন তিনি শহরের পথে… পেভেলের কাছে যেতে লজ্জা হচ্ছে…কারণ তাঁর পেটে একটি সন্তান… আর একটি কোলে…মাঠে আরো অনেক ছেলের মেলা, বল খেলছে তারা…কোলের ছেলেটা তাদের দেখে জোরে কাঁদছে…সৈন্যরা ধেয়ে আসছে সঙিন উঁচিয়ে…মা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলেন মাঠের মাঝখানে উঁচু গির্জায়…শ্রাদ্ধ-কৃত্য চলছে সেখানে, পুরুতরা গাইছে…একজন পুরুত আলো নিয়ে এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, গ্রেপ্তার কর…দেখতে দেখতে পুরুত হ'য়ে গেলো সামরিক কর্মচারী… সবাই ছুটে পালাচ্ছে…মা পলাতকদের সামনে কোলের ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে বলছেন, পালিয়োনা, ছেলেটার মুখ চাও…এণ্ড্রি ছেলেটাকে কাঠ-বোঝাই গাড়িতে চাপিয়ে দিলো…নিকোলাই গাড়ির পাশে হেঁটে

চলেছে···হেসে বলছে, এবার একটা শক্ত কাজের ভার পেয়েছি।··· কাঁচা পথ···জান্‌লায় জান্‌লায় নর-মুণ্ডের ভিড়। এণ্ড্রি বলছে, গাও মা জীবনের জয়গান···মা ঠাট্টা ভেবে রাগছেন···তারপর হঠাৎ পথের পাশের অতল গহ্বরে টলে পড়ে গেলেন···আতঙ্ক-ভরা চীৎকারে মা'র ঘুম ভাঙলো। মা উঠে পড়লেন। তারপর হাত-মুখ না ধুয়েই তিনি ঘর গোছাতে লেগে গেলেন। নিশানের টুকরো তুলে উনোনে দিতে গিয়ে, হঠাৎ কি ভেবে লাল কাপড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলেন। জান্‌লা ধুলেন, মেঝেয় ধুলেন, স্নান করলেন, চা চাপালেন··· তারপর যেন আর কোনো কাজই রইল না তাঁর! কেবল মনে হ'তে লাগলো, এখন ?—এখন কি করি ?

হঠাৎ মনে পড়লো, প্রার্থনা করা তো হয়নি !

প্রার্থনায় বসলেন···প্রার্থনা করলেন, কিন্তু প্রাণ তবু শূন্য। সময় আর কাটে না !

এমন সময় নিকোলাই আইভানোভিচ এসে দেখা দিলো। মা ভয় পেয়ে ব'লে উঠলেন, এখানে এসেছ কেন ? টের পেলেই ধরবে ওরা।

আইভানোভিচ মাকে আশ্বস্ত ক'রে বললো, এণ্ড্রি-পেভেলের সঙ্গে কথা ছিল, তারা ধরা পড়লে তোমায় আমি শহরে নিয়ে যাবো। যাবে তো, মা !

যাবো, ওরা যখন ব'লে গেছে—আর তোমার যদি কোনো অসুবিধা না হয়।

অসুবিধা কিছু হ'বে না, মা। সংসারে লোক মাত্র আমরা দু'টি—আমি আর আমার বোন শোফি। কিন্তু সেও থাকে না, মাঝে মাঝে আসে।···

মা বললেন, হাঁ, যাবো আমি। এখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে পারি না।

আইভানোভিচ বললো, কাজ তুমি আমাদের ওখানে পাবে, মা।

আমি ঘরের কাজের কথা বলছিনে!

ঘরের কাজ নয়, যে কাজ তুমি চাও, তাই।

কি কাজ দেবে আমায়?

জেলে পেভেলের সঙ্গে দেখা ক'রে সেই চাষী যে কাগজ বের করবার কথা বলেছিল, তার ঠিকানা যদি আনতে পারো!

মা সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, জানি, তার ঠিকানা আমি জানি। কাগজ দাও, আমি দিয়ে আসছি তাদের।...আমায় একাজে টেনে নাও ...সর্বত্র আমি যাবো তোমাদের কাজে...শীত মানবো না, গ্রীষ্ম মানবো না, মৃত্যু দেখেও শিউরে উঠবো না...সত্য-পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে এগিয়ে যাবো...আমায় কাজ দাও।

চারদিন পরে আইভানোভিচ মাকে তার শহরের বাড়িতে নিয়ে গেলো।

—দুই—

মা যেন এক ছেলের বাড়ি থেকে আর এক ছেলের বাড়ি এসেছেন। কোন সংকোচ, কোন অসুবিধা নেই তাঁর। সংসারে কোন-কিছু গোছানো ছিল না, মা তা' পরিপাটি করে গুছিয়ে নিলেন।

চা খেতে খেতে আইভানোভিচ বললো, আমি যে বোর্ডে কাজ করি, মা, তার কাজ হল চাষীদের অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে রিপোর্ট দেওয়া—

বাস, ঐ পর্যন্ত। তাদের দুঃখমোচন করার কোনো চেষ্টা আমরা করি নে।…আমরা দেখি…তাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের অকাল-মৃত্যু—আমরা দেখি, তাদের ছেলেরা জন্মায় ক্ষীণপ্রাণ, মরে মাছির মতো…তাদের দুঃখের কারণ কি, তাও আমরা জানি, আর তার জন্য বেতন পাই।

মা জিগ্যেস করলো, তুমি ছাত্র নও?

না। আমি বোর্ডের অধীনে জনৈক গ্রাম্য শিক্ষক।…চাষীদের বই পড়তে দিতুম…এই অপরাধে আমার জেল হ'ল…জেল থেকে বেরিয়ে এক বইয়ের দোকানে কাজ নিলুম এবং সেখানেও সতর্ক হ'য়ে চললুম না ব'লে আবার জেল…তারপরে আর্চাঞ্জেলে নির্বাসন।…সেখানে হ'ল গভর্ণরের সঙ্গে সংঘর্ষ…ফলে ঠেলে পাঠালো শ্বেত-সাগরের উপকূলে… পাঁচ বছর সেখানে কাটিয়ে এলুম।…

এমন ভীষণ দুঃখকেও মানুষ কেমনভাবে এতো সহজ করে নিতে পারে।…মা সেই কথা ভাবতে লাগলেন।

আইভানোভিচ বললো, শোফি আসছে আজ।

বিয়ে হয়েছে তার?

সে বিধবা।…তার স্বামী সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়। তারপর পালায় সেখান থেকে। পথে ঠাণ্ডায় সর্দি হয়ে মারা যায়—প্রায় দু'বছর আগে।

শোফি কি তোমার ছোট?

দু'বছরের বড়। তার কাছে আমি বহুঋণে ঋণী। ওঃ, সে যা পিয়ানো বাজায়, চমৎকার!

থাকে কোথায়?

সর্বত্র। যেখানে সাহসী লোকের দরকার সেইখানেই শোফি হাজির।

এ কাজে আছে?

নিশ্চয় !

দুপুরের দিকে শোফি এসে হাজির হ'ল। আসতে-না-আসতেই মার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেলো তার, বললো, পেভেলের মুখে তোমার কথা শুনেছি, মা।

পেভেল অন্যের কাছেও তাঁর কথা বলতো শুনে মার মনটা খুশিতে ভ'রে উঠলো।

শোফি বললো, মার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

মা বললেন, কষ্ট, হাঁ, কষ্ট বৈ কি ! আগে হলে কষ্টই হত—কিন্তু এখন জানি, সে একা নয়, আমিও একা নই।

শোফি তখন কাজের কথা পাড়লো, বললো, এখন সব চেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে, ওদের যাতে জেলে না পচতে হয়। বিচার শিগগিরই হচ্ছে। তারপর যক্ষুণি তাদের নির্বাসনে পাঠানো হবে, আমরা পেভেলকে মুক্ত করার চেষ্টা করব। সাইবেরিয়ায় তার কিছু করার নেই, তাকে এখানে দরকার।

মা বললেন, মুক্ত যেন সে হ'ল, কিন্তু ফেরারী হ'য়ে থাকবে কি ক'রে ?

শোফিয়া বললো, আরও শত শত ফেরারী যেমন করে থাকে। এইতো, এই মাত্র একজনকে বিদায় দিয়ে এলুম। দক্ষিণ অঞ্চলে কাজ করতো সে। পাঁচবছরের নির্বাসন-দণ্ড ছিল···রইল মাত্র সাড়ে তিন মাস···তাইতো আমার এই পোশাকের জাঁকজমক···নইলে সত্যিই কি আর আমি এতোটা বাবু !

পুলিসের চোখে ধুলো দিতেই শোফি সাজ-পোশাক করেছিল ফ্যাশান-দুরস্ত, মুখে ছিল তার সিগারেট ! এবার সে-সব ধরাচূড়া ছেড়ে সহজ, সরল, স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে পিয়ানো নিয়ে বসলো।

আইভানোভিচ মিথ্যা বলেনি। শোফি পিয়ানো বাজায় অপূর্ব! তার হাতে পিয়ানো যেন কথা কইতে লাগলো। নানা ভাব, নানা রস শ্রোতাদের মনের মধ্য দিয়ে ঢেউ খেয়ে গেলো। মা মুগ্ধ হ'য়ে শুনলেন সে সঙ্গীত। তাঁর সমস্ত অতীত যেন বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠলো দুঃখ-করুণ ছন্দে ছন্দে। মার মুখ ফুটলো। ধীরে ধীরে তিনি বর্ণনা ক'রে গেলেন তাঁর দুর্বিষহ বন্দিনী জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখ কাহিনী।...এতো তিনি শুধু তাঁর নিজের কথা বলছেন না—তাঁরই মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত নরনারীর অকথিত কাহিনী ব্যক্ত হচ্ছে। সেই জীবনের পর এই জীবন—জাগ্রত, জলন্ত জীবন...যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, মানুষ কি ছিল, কি সে হয়েছে এবং কি সে হতে পারে।

মার কাহিনী শুনে শোফি বললো, একদিন আমি মনে করেছিলুম, আমি অসুখী...তখন আমি একটি ক্ষুদ্র শহরে নির্বাসিত ..হাতে কোন কাজ নেই...নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাববার নেই—কাজেই দুঃখ-গুলিকে জড়ো ক'রে ওজন করতে বসে গেলুম...তারপর বাবার সঙ্গে বিচ্ছেদ হল—জিম্‌নাসিয়াম থেকে আমি বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হলুম... তারপর জেল-সহকর্মীর বিশ্বাস-ঘাতকতা, স্বামীর নির্বাসন...আমার পুনরায় কারাদণ্ড এবং নির্বাসন, স্বামীর মৃত্যু—এম্‌নি বহু দুঃখ পেয়েছি আমি। কিন্তু এসব এবং এর দশগুণ দুঃখ একত্র করেও তোমার জীবনের একমাসের দুঃখের সমান হয় না, মা! বছরের পর বছর, প্রত্যেকটি দিন তুমি কি যাতনাই না সহ্য করেছো। এমন সহ্যশক্তি তোমরা কোথায় পাও, মা!

মা বললেন, আমদের সইতে সইতে অভ্যাস হ'য়ে যায়।

শোফি বললো, আমি ভেবেছিলুম, জীবনকে আমি পুরোপুরি

চিনেছি। কিন্তু আজ দেখছি ভুল। বইয়ে যা পড়েছি, কল্পনায় যা তার আন্দাজ করে নিয়েছি—তোমার মতো ভুক্তভোগীর কথা শুনে বুঝলুম, তার চাইতে ঢের, ঢের বেশি ভীষণ বাস্তব জীবন।…

এমনি আরো অনেক কথা হ'ল।

কাগজ সম্বন্ধে স্থির হ'ল, শোফি মার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে সেই চাষীর সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে আসবে। গ্রামটা সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে।

—তিন—

তিনদিন পরে মজুরানীর ছদ্মবেশে শোফি আর মা যখন বেরিয়ে পড়লেন গ্রামের উদ্দেশে, তখন তাঁদের চেনাই দায় হল। মনে হল যেন তাঁরা আজীবন এই বেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দু'পাশে গাছের সারি, মাঝখানে পথ। হাঁটতে হাঁটতে মা প্রশ্ন করলেন, হাঁটতে কষ্ট হবে না তো ?

শোফি হেসে বললো, এ পথে কি আমি এই নতুন বেরিয়েছি ভাবছ, মা ? আমার এসব অভ্যেস আছে।…

তারপর মানুষ যেমন ক'রে ছেলেবেলায় খেলা-ধুলোর কথা বর্ণনা করে তেমনি ক'রে বলে গেলো শোফি তার বিচিত্র বিপ্লব-কাহিনী। কখনো সে রয়েছে নাম ভাঁড়িয়ে, দলিল-পত্র করেছে জাল। কখনো গোয়েন্দাদের চোখে ধূলি দিতে আত্মগোপন করেছে রকম-বেরকমের ছদ্মবেশে। শহরে শহরে চালান করেছে শত শত নিষিদ্ধ পুস্তক।

নির্বাসিত সঙ্গীদের মুক্তির আয়োজন ক'রে দিয়েছে···সঙ্গে করে তাদের বিপদ-সীমার বাইরে রেখে এসেছে। তার বাড়িতে একটা ছাপাখানা ছিল···পুলিস খানাতল্লাশ করতে এলে এক মিনিটের মধ্যে ভেল বদলে চাকরের সাজে আগন্তুকদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে···তারপর গায়ে একখানা র‍্যাপার জড়িয়ে, মাথায় রুমাল বেঁধে, হাতে একটা কেরোসিনের টিন নিয়ে কেরোসিন-ওয়ালীর বেশে শীতের কনকনে হাওয়ায় শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চ'লে গেলো।·· আর একবার সে এসেছে নতুন এক শহরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে···তাদের বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে এমন সময় দেখতে পেলো তাদের ঘরে খানাতল্লাশ করছে পুলিস ; ফেরা তখন নিরাপদ নয়···এক সেকেণ্ড ইতস্তত না করে নির্ভীকভাবে সে নিচের তলায় একটা ঘরের ঘণ্টা বাজিয়ে ব্যাগ হাতে অপরিচিত লোকদের মধ্যে ঢুকে পড়লো—তারপর সরলভাবে নিজের অবস্থার কথা ব্যক্ত ক'রে বললো, আমায় ইচ্ছা হলে আপনারা পুলিসের হাতে দিতে পারেন ; কিন্তু আমি জানি, আপনারা তা দেবেন না। লোকগুলো অত্যন্ত ভয় পেলো। সমস্ত রাত ঘুমোলোনা।· প্রত্যেক মিনিট আশঙ্কা করে, এই বুঝি পুলিস এসে দরজা ঠেলে···কিন্তু তবু আমাকে ধরিয়ে দিতে মন উঠল না···পরদিন এই নিয়ে হাসাহাসি। ···তারপর আর একবার সে রেলগাড়িতে চলেছে একজন গোয়েন্দার সঙ্গে একই গাড়িতে, একই আসনে···তার সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ···গোয়েন্দাটি তখন তারই খোঁজে বেরিয়েছিল···তারই কাছে গোয়েন্দা গল্প জুড়ে দিলো, কেমন দক্ষতার সঙ্গে সে শোফিকে খুঁজে বের করেছে···শোফি নাকি ঐ গাড়িরই দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় আছে···গাড়ি থামে, আর প্রত্যেকবার সে খুঁজে দেখে এসে শোফিকে বলে, না, তাকে

দেখছি না,ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। ওদের তো মেহনৎ কম নয়, আমাদের মতো ওদেরও জীবন বিপদসংকুল!...

মা তার কাহিনী শুনে প্রাণ খুলে হাসেন। শোফির দীর্ঘ উন্নত দেহ, গভীর কালো চোখ দিয়ে ফুটে বেরোয় একটা দীপ্তি, একটা সাহস, একটা অনাবিল আনন্দ। পাখির গান শুনতে শুনতে, পথের ফুল তুলতে তুলতে, নৈসর্গিক দৃশ্যের ওপর মুগ্ধ-দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে দু'জন গ্রামের দিকে এগিয়ে চললো। শোফির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তিখানির দিকে চেয়ে মা বললেন, তুমি এখনো তরুণ!

শোফি হাসতে হাসতে বললো, আমার বয়স, মা, বত্রিশ বছর।

মা বললেন হোক, কিন্তু তোমার চোখ, তোমার কণ্ঠ এতো সজীব যে তোমাকে তরুণী বলে মনে হয়। এতো বিপদসংকুল জীবন তোমার অথচ প্রাণ তোমার হাসছে।

শোফি বললো, প্রাণ আমার হাসছে, চমৎকার বলেছো, মা, কিন্তু কষ্ট! কই, না তো! আমিতো মনে করি, এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে মজার জীবন আর হ'তে পারে না!

মা বললেন, সব চেয়ে তোমাদের এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে। তোমরা জান, মানুষের প্রাণে ঢুকতে হয় কোন্ পথ দিয়ে। নির্ভয়ে, নির্ভাবনায় মানব-প্রাণের সমস্ত-কিছু তোমাদের সামনে খুলে যায়। পৃথিবীতে অন্যায়কে তোমরা জয় করেছো, সম্পূর্ণভাবে জয় করেছো।

শোফি জোর দিয়ে বললো, হাঁ, মা, আমরা জয়ী হব; কারণ আমরা মজুরদের সঙ্গে এক হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। তাদের কাছ থেকেই আমরা পাই আমাদের কর্মশক্তি—সত্য যে জয়যুক্ত হবে এই স্থিরবিশ্বাস। তারাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত দৈহিক এবং অলৌকিক শক্তির অফুরন্ত উৎস।

তাদেরই মধ্যে নিহিত আছে সকল সম্ভাবনা, তাদেরই নিয়ে হ'চ্ছে সকল-কিছু সম্ভব। শুধু উদ্বুদ্ধ করা চাই তাদের শক্তি, তাদের জ্ঞান, তাদের আশা, তাদের বর্ধিত হবার, বিকশিত হবার স্বাধীনতা।

মা বলেন, কিন্তু এর জন্য কি পুরস্কার পাবে তোমরা!

শোফি সগর্বে জবাব দিলো, পুরস্কারতো আমরা পেয়েই গেছি, মা! আমরা এমন এক জীবনের আস্বাদ পেয়েছি যা আমাদের তৃপ্তি করেছে—প্রসারিত, পরিপূর্ণ আত্মার শক্তিতে সমুজ্জ্বল আমাদের জীবন···দুনিয়ায় আর কি চাই আমাদের?

তিনদিনের দিন তাঁরা সেই গাঁয়ে এসে পৌঁছলো। মাঠে একজন চাষী কাজ করছিল। তার কাছ থেকে রাইবিনের ঠিকানা জেনে নিয়ে তাঁরা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

রাইবিন, ইয়াফিম্ এবং আরো দু'জন চাষী টেবিলে বসে খাচ্ছে। এমন সময় মা গিয়ে ডাক দিলেন, ভালো আছো, রাইবিন!

রাইবিন ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে মার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলো। মা বললেন, আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, রাইবিন। ভাবলুম পথে ভাইকে একবার দেখে যাই। এ আমার বন্ধু আনা।

রাইবিন শোফিকে অভিবাদন ক'রে মাকে বললো, কেমন আছো?···মিছে কথা বলো না···এ শহর নয়···সব আমাদেরই লোক এখানে···মিছে বলাব দরকার নেই।

সবাই আগন্তুকদের দিকে চেয়ে আছে।

রাইবিন বললো, আমরা সন্ন্যাসীর মতো আছি এখানে···কেউ আমাদের কাছ দিয়ে ঘেঁসে না···কর্তাও বাড়ি নেই···কর্ত্রী গেছেন হাসপাতালে

…আমি হলুম এখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট…বস…নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত তোমরা… ইয়াফিম, দুধ নিয়ে এসো ভাই!

ইয়াফিম ধীরে ধীরে উঠে গেলো দুধ আনতে। আর দু'জন সঙ্গীর পরিচয় দিলো রাইবিন…এই ইয়াকব, এই ইগ্নাতি!

তারপর জিগ্যেস করলে, পেভেল কেমন আছে?

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সে জেলে!

জেলে! আবার! জেল বুঝি ভারি ভালো লেগেছে তার!

ইয়াফিম মাকে বসালো। রাইবিন শোফিকে বললো, বস।

শোফি একটা গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলো রাইবিনকে।

রাইবিন মাকে জিগ্যেস করলো, কবে নিয়ে গেলো পেভেলকে? তোমার দেখছি কপাল মন্দ…কি হ'য়েছিল?

মা সংক্ষেপে পয়লা মের ব্যাপার বর্ণনা ক'রে গেলেন। শুনে ইয়াফিম বললো, গাঁয়ে ও রকম শোভা-যাত্রা করলে চাষীদের ওরা জবাই করবে।

ইগ্নাতি বললো, ত ঠিক।…কারখানাই ভালো, আমি শহরে যাবো।

রাইবিন জিগ্যেস করলো, পেভেলের বিচার হবে?

হাঁ!

কি শাস্তি হ'তে পারে? শুনেছো কিছু?

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসন—মা শান্ত কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন। তিনজন চাষী একসঙ্গে বিস্মিত হয়ে মার দিকে চাইলো। রাইবিন মুখ নিচু ক'রে ফের জিগ্যেস করলো, কাজে যখন নেবেছিল, তখন সে একথা জানতো?

মা বললেন, জানিনে, জান্‌তো বোধ হয়!

শোফিয়া হঠাৎ জোরগলায় ব'লে উঠলো, 'বোধ হয়' নয়, 'ভালো করেই' জানতো।

সবাই নীরব, নিশ্চল···যেন জমাট বেধে গেছে শীতে।

রাইবিন ধীরে ধীরে বললো, আমারও তাই মনে হয়, সে জানতো। খাঁটি লোক, না ভেবে কোনো কাজে নাবে না।···সে জানতো, তার সম্মুখে সঙিন, তার সম্মুখে নির্বাসন। জেনে শুনেই সে গেলো। যাওয়া দরকার, তাই সে গেলো। যদি মা তার পথ রোধ করে শুয়ে থাকতেন, সে ডিঙিয়ে চলে যেতো। নয় কি, মা?

হাঁ।

রাইবিন তার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বললো, এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ নেতা।

আবার খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে রইলো। তারপর ইয়াকব হঠাৎ বলে উঠলো, ইয়াফিমের সঙ্গে গিয়ে সৈন্য-বিভাগে যোগ দিলে আমাদের লেলিয়ে দেওয়া হবে এই পেভেলের মতো মানুষের ওপর।

রাইবিন গম্ভীর মুখে বললো, তবে আর কাদের ওপর লেলিয়ে দেবে মনে কর? আমাদেরই হাত দিয়ে ওরা আমাদেরই কণ্ঠরোধ করে। এইখানেই তো ওদের যাদু।

ইয়াফিম জেদের সুরে বললো, কিন্তু আমি সৈন্যদলে যোগ দেবোই! ইগ্নাতি বলে উঠলো, কে বারণ করছে তোমায়? যাও, মরোগে।···

তারপর হেসে বললো, গুলি যখন করবে আমাদের, মাথা লক্ষ্য ক'রে কোরো,···যেন এক গুলিতেই সাবাড় হই···আহত হ'য়ে মিছি-মিছি না ভুগি।

রাইবিন সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে বললো, এই মাকে দেখ···ছেলেকে এঁর

কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাতে কি ইনি দমেছেন?—না, দমেন নি! ছেলের স্থান পূর্ণ করেছেন এসে তিনি নিজে।

তারপর সজোরে টেবিল চাপড়ে বললো, ওরা জানে না, অন্ধের মতো কিসের বীজ বুনে চলেছে ওরা! কিন্তু জানবে, সেদিন জানবে, যেদিন আমাদের শক্তি হ'বে পরিপূর্ণ···সেদিন এই বীজ পরিণত হ'বে বিষের ফসলে—আর আমরা কাটব সেই অভিশপ্ত ফসল।···

রাইবিনের রক্ত-চক্ষু থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, দুর্দমনীয় ক্রোধে মুখ হয়ে উঠেছে লাল। একটু থেমে আবার সে বলতে লাগলো, সেদিন এক সরকারী কর্মচারী আমাকে ডেকে ব'লে, এই পাজি, পুরুতকে তুই কি বলেছিস্? জবাব দিলুম, আমি পাজী হলুম কি ক'রে? কারো কোনো ক্ষতিও করিনে, আর খাইও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, খেটে। বলতেই হুংকার দিয়ে উঠে লাগালো মুখে এক ঘুষি!···তিন-দিন তিন-রাত রাখলো হাজতে পু'রে!···

অদৃশ্য সরকারী কর্মচারীর উদ্দেশে তর্জন ক'রে রাইবিন বললো, এম্নি ক'রে তোমরা লোকের সঙ্গে কথা কও—না? শয়তানের দল, মনে ভেবেছো ক্ষমা করব? না, ক্ষমা নেই। অন্যায়ের প্রতিশোধ নোবই নোব। আমি না পারি, আর কেউ নেবে। তোমাদের না পাই, তোমাদের ছেলেদের ধরব। মনে রেখো এ কথা। লোভের লৌহ-নখর দিয়ে মানুষকে তোমরা রক্তাক্ত করেছো, তোমরা হিংসার বীজ বপন করেছো, তোমাদের ক্ষমা নেই।

রাগ যেন রাইবিনের মনে গর্জাতে লাগলো। শেষটা সুর একটু নরম ক'রে সে বললো, আর, পুরুতকে আমি কি বা বলেছিলুম? গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পর চাষীদের নিয়ে পথে বসে তিনি বোঝাচ্ছেন, মানুষ হচ্ছে

মেষপাল, আর তাদের সব সময়ের জন্যই চাই একজন মেষ পালক! তা' শুনে আমি ঠাট্টা করে বললুম, হাঁ, সেই যেমন এক বনে শেয়ালকে ক'রে দেওয়া হল পক্ষী-পালক। দু'দিন বাদে দেখা গেলো, রাশি রাশি পালকই পড়ে আছে বনে, পক্ষী আর নেই। পুরুত আমার দিকে একবার আড়-নয়নে চেয়ে বলে যেতে লাগল, চাই ধৈর্য, ঈশ্বরের কাছে কেবল প্রার্থনা করো, প্রভু, আমার ধৈর্য দাও। আমি বললুম, প্রভুটির যে ফুরসুৎ নেই শোনার, নইলে ডাকতে কি আমরা কসুর করছি? পুরুত তখন অগ্নিশর্মা হ'য়ে বললেন, তুই ব্যাটা আবার কী প্রার্থনা ক'রে থাকিস্? আমি বললুম, করি ঠাকুর, একটা প্রার্থনা আমি করি,—যা শুধু আমি কেন, মানুষ মাত্রেই ক'রে থাকে। সেটা হচ্ছে এই, হে ভগবান, দুনিয়ার এই কর্তাগুলোকে দিয়ে একবার ইটের বোঝা বওয়াও, পাথর ভাঙাও, কাঠ ফাড়াও···পুরুত আমার কথাটাও শেষ করতে দিলে না।

তারপর আচম্‌কা শোফির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, আপনি কি ভদ্রমহিলা?

শোফি এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে মৃদুকণ্ঠে বললো, আমাকে ভদ্রমহিলা ব'লে মনে করার কারণ?

রাইবিন হেসে বললো, কারণ? কারণ, ছদ্মবেশও আপনাকে ঢেকে রাখতে পারেনি। ভিজে টেবিলে হাত পড়তেই আপনি শিউরে হাত টেনে নিলেন বিরক্তিভরে, তা'ছাড়া, আমাদের মেয়েদের মেরুদণ্ড অতো সোজা হয় না।

রাইবিন পাছে শোফিকে অপমান করে ফেলে এই ভয়ে মা বললেন, ইনি আমাদের দলের একজন নামজাদা কর্মী! এই কাজে ইনি মাথার চুল পাকিয়েছেন। তোমার ওসব বলা উচিত নয়।

রাইবিন বললো, কেন ? আমি কি অপমানকর কিছু বলেছি, বলে শোফির দিকে চাইলো।

শোফি হেসে বললো, না কিন্তু কিছু বলতে চাও আমায় ?

আমি বলবনা কিছু। ইয়াকবের এক ভাই কি যেন কি বলবে। তাকে ডাকব ?

ডাকো।

রাইবিন তখন ইয়াফিমকে অনুচ্চকণ্ঠে বললো, তুমি যাও, বোলো, সন্ধ্যার সময় যেন আসে।

তারপর মা ও শোফি পোঁটলা খুলে মেলা বই এবং কাগজ বের ক'রে দিলেন রাইবিনকে। রাইবিন বই-কাগজ পেয়ে খুশি হল। শোফির দিকে চেয়ে বললো, কতোদিন ধরে একাজে আছেন আপনি ?

বারো বছর।

জেলে গেছেন ?

হাঁ।

অপরাধ নেবেন না এসব প্রশ্নে। ভদ্রলোক আর আমরা যেন আলকাতরা আর জল, মিশিনে সহজে !

শোফি হেসে বললে, আমি ভদ্র নই, আমি শুধু মানুষ।

রাইবিন, ইগ্নাতি, ইয়াকব বই-কাগজ নিয়ে সানন্দে ঘরের ভেতর চলে গেলো। তারপর পড়তে শুরু করলো অসীম আগ্রহে। শোফি দেখলে, সত্য জানার জন্য এদের কী বিপুল আগ্রহ—আনন্দদীপ্ত মুখে সে এসে দেখতে লাগলো, তাদের পাঠ।

ইয়াকব কি একটা প'ড়ে মুখ না তুলেই বললো, কিন্তু এসব কথায় আমাদের অপমান হয়।

রাইবিন বললো, না ইয়াকব, হিতাকাঙ্ক্ষীরা যাই বলুন, তাতেঁ অপমান হতে পারে না।

ইগ্নাতি বললো, কি লিখছে শোনো, 'চাষীরা আর মানুষ নেই'। থাকবে কি ক'রে? তোমরা এসে দু'দিন থাকো আমাদের ভেল নিয়ে— দেখবে তোমরাও আমাদেরই মতো হয়ে গ্যাছো।

এমনিভাবে চললো পড়া।

মা ঘুমিয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ বাদে পড়া শেষ করে চাষীরাও চলে গেলো কাজে।

—চার—

সন্ধ্যার সময় রাইবিনরা কাজ থেকে ফিরে এসে চা খেতে বসলো। হঠাৎ ইয়াফিম বলে উঠলো, ঐ কাশির শব্দ···শুনচ?

রাইবিন কান পেতে শুনে শোফিকে বললো, হাঁ, ঐ সে আসছে··· সেভ্‌লি আসছে। পারলে আমি ওকে শহরের পর শহরে নিয়ে যেতুম, পাবলিক স্কোয়ারে দাঁড় করিয়ে দিতুম, লোকে ওর কথা শুনতো। ও একই কথা বলে সব সময়, কিন্তু সে কথা সকলেরই শোনার যোগ্য।

বনের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে লাঠি ভর ক'রে বেরিয়ে এলো এক আনত, শীর্ণ, কঙ্কাল···তার নিশ্বাসের শব্দ কানে এসে বাজছে। গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা কোট, শুকনো খাড়া কটা চুল, মুখ আদ্দেক হা-করা, চোখ কোটরাগত, ধক্ ধক্ করে জ্বলছে···রাইবিন শোফির সঙ্গে তার পরিচয় করে দিতেই বললো, আপনিই চাষীদের জন্য বই এনেছেন?

হাঁ।

চাষীদের পক্ষ হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! ওরা এখনো এই বই, যাতে সত্য প্রচার করা হয়েছে, তার মর্ম বোঝে না। এখনো ওদের চিন্তা-শক্তির স্ফুরণ হয়নি, কিন্তু আমি সব নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি এবং সেই জন্যই ওদের হ'য়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।...

এত কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো, কাঠির মতো আঙুলগুলি দিয়ে বুক চেপে অতি কষ্টে সে ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলো শুকনো মুখের মধ্য দিয়ে। শোফি বললো, সন্ধ্যাবেলায় এতো ঠাণ্ডায় বেরোনো ভাল হয়নি আপনার।

ভালো! আমার পক্ষে ভালো এখন একমাত্র মরণ · আমি মরতে চলেছি। মরব, কিন্তু মরার আগে লোকের একটা উপকার করে যাবো, সাক্ষ্য দিয়ে যাবো—কত পাপ, কত অনাচার আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আটাশ বছর বয়স আমার—কিন্তু এখনই আমি মরতে চলেছি! দশ বছর আগে অনায়াসে পাঁচশো পাউণ্ড আমি কাঁধে তুলে নিতে পারতুম...এ শক্তি নিয়ে সত্তর বছর বাঁচার কথা, কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই আমি শেষ হ'য়ে গেলুম। কর্তারা ডাকাত...তারা আমার জীবন থেকে চল্লিশটা বছর ছিনিয়ে নিয়েছে, চল্লিশটা বছর চুরি করেছে!

রাইবিন শোফির দিকে চেয়ে বললো, শুনলেন তো—এই হচ্ছে ওর সুর।

সেভ্‌লি বললো, শুধু আমার নয়, হাজার হাজার লোকের সুর এই। কিন্তু তারা আওড়ায় এটা তাদের নিজেদের মনে মনে। বোঝেনা, তাদের

এই মন্দভাগ্যজীবন দেখে মানুষ কতবড় একটা শিক্ষা পেতে পারে। কতলোক মরণের কোলে হেলে পড়েছে শ্রমের নিপীড়নে ; কত লোক পঙ্গু বিকলাঙ্গ হ'য়ে ক্ষুধায় ধুকতে ধুকতে নীরবে প্রাণ দিচ্ছে। বজ্রকণ্ঠে আজ সেই কথা প্রচার করা দরকাব, ভাইসব, বজ্রকণ্ঠে সেই কথা প্রচার করা দরকার।

উত্তেজনায় সেভ্‌লি কাঁপতে লাগলো।

ইয়াফিম বললো. তা কেন? মানুষ আমি, সুখ যতটুকু পাই, তার কথাই জানুক, দুঃখ আমার মনে মনেই থাক, কারণ সে আমার একান্ত নিজস্ব জিনিস।

রাইবিন বললো, কিন্তু সেভ্‌লির দুঃখ শুধু ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ইয়াফিম,·· লক্ষ লক্ষ মানুষ আমরা যে দুঃখ ভুগছি, ও তারই একটা জলন্ত উদাহরণ। ওর মাঝে আমরা নিজেদের ভাগ্যই প্রতিফলিত দেখতে পাই। ও একদম তলা পর্যন্ত নেবেছে···ভুগেছে···তার পর দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, হুসিয়ার, এদিক পানে পা বাড়িয়ো না।

ইয়াকব সেভ্‌লিকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে বসালো। বসে সেভ্‌লি আবার বলতে আরম্ভ করলো, কাজের চাপে মানুষকে পিষে মারে ওরা। ধ্বংস করে মানুষের প্রাণ! কেন? কিসের জন্য? আজ জবাব চাই তার। আমার মুনিব···তার কাপড়ের কলে আমার জীবন দিলুম আমি···আর তিনি? তিনি করলেন কি?—এক প্রণয়িনীকে সোনার হাত-ধোয়ার পাত্র উপহার দিলেন।···শুধু তাই নয়, প্রণয়িনীর প্রত্যেকটি প্রসাধন-দ্রব্য হ'ল সোনার। সেই পাত্রের মধ্যে আমার বুকের রক্ত, সেই পাত্রের মধ্যে আমার সমগ্র জীবন। ওরই জন্য জীবন গেছে আমার! একটা লোক আমাকে খাটিয়ে খুন করলো! কেন? না,

—আমার রক্ত ছাড়া তার প্রণয়িনীর সুখ-সুবিধা হয় না, তার প্রণয়িনীর জন্য সোনার পাত্র কেনা হয় না।

ইয়াফিম মৃদু হেসে বললো, ঈশ্বরের মূর্তি ধরে নাকি মানুষ তৈরি হয়েছে—সেই ঈশ্বরের মূর্তির এই অবস্থা! চমৎকার বলতে হ'বে।

রাইবিন টেবিল চাপড়ে বললো, আর আমরা চুপ ক'রে থাকবো না।

ইয়াকব যোগ করলো, সহ্য করবো না।

মা শোফির দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে শোফিকে জিগ্যেস করলেন, যা' বলছে তা' সত্যি?

হাঁ। খবরের কাগজে এরকম উপহারের কথা বেরোয়। আর ও যেটা বললো, ও ব্যাপারটা মস্কোর।

রাইবিন প্রশ্ন করলো, কিন্তু সেই মুনিবের—ফাঁসি হ'ল না তার? কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। তাকে ঘর থেকে টেনে বের ক'রে জনসাধারণের সামনে হাজির ক'রে, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে তার অপবিত্র নোঙরা মাংস-পিণ্ড কুকুরের মুখে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল। একবার মানুষ জাগুক, তখন তারা এক বিরাট বধ্যমঞ্চ প্রস্তুত করবে, আর সেখানে ওদের অজস্র রক্তধারায় ধৌত করবে এতদিনের অন্যায়। ওদের রক্ত ওদের নয়…ও আমাদের…আমাদের রক্ত আমাদের শিরা থেকে শোষণ ক'রে নিয়েছে ওরা।…

সেভ্‌লি ব'লে উঠলো, শীত করছে।

ইয়াকব তাকে ধরে আগুনের কাছে বসিয়ে দিলো। রাইবিন সেভ-লিকে দেখিয়ে অনুচ্চস্বরে শোফিকে বলতে লাগলো, বইয়ের চেয়ে ঢের বেশি মর্মস্পর্শী এই জীবন-গ্রন্থ। মজুরের হাত যখন কাটা পড়ে—দোষ মজুরের নিজের। কিন্তু এমনিভাবে একটা লোকের রক্তমোক্ষণ ক'রে

তার শবটাকে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তখন ?—তখন কি বুঝতে হ'বে ? হত্যার অর্থ বুঝি, কিন্তু এই নির্যাতন, এর মানে বুঝতে পারিনে। আমাদের ওপর ওদের এ নির্যাতন···ওরা কেন করে জানো ?—করে দুনিয়ার আমোদ-উৎসব, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব আত্মসাৎ করবে বলে—করে যাতে মানুষের রক্ত দিয়ে ওরা সব-কিছু কিনতে পারে—সুন্দরী গণিকা, ব্যার্মিজ টাট্টু, চাঁদির ছুরি, সোনার থালা, ছেলেমেয়ের খেলনা। তোরা কাজ কর, কাজ কর, আরো কাজ কর, কেবল কাজ কর, আর আমরা ? আমরা তোমাদের মেহনতের কড়ি জমাই, আমাদের প্রণয়িনীকে সোনার পাত্র কিনে এনে দিই।···

সেভ্‌লি বললো, আমি চাই তোমরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এই রিক্ত-সর্বস্ব জনগণেব ওপর অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নাও।

রাইবিন বললো, রোজ ও আমাদের এই কথা শোনাবে।

মা ব'লে উঠলেন, আর কি শুনতে চাও তোমরা ? হাজার হাজার মানুষ যেখানে দিনের পর দিন কাজ ক'রে মরছে, আর মুনিব তাদের মেহনতের কড়ি দিয়ে মজা লুঠছে, সেখানে আর কি শুনতে চাও তোমরা ?

শোফি তখন দেশ-বিদেশের মজুর-প্রগতির কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করে গেলো, তারপর বললো, দিন আসছে, যেদিন সারা দুনিয়ার মজুরেরা মাথা তুলে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করবে, এ জীবন আর চাইনে আমরা। এ জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি হোক। সেদিন লুব্ধ ধনীর কাল্পনিক শক্তি তাসের ঘরের মত লুটিয়ে পড়বে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে, তাদের অবলম্বন অন্তর্হিত হ'বে।

রাইবিন বললো, আর তার জন্য চাই একটা জিনিস—নিজেদের হীন মনে করোনা, তাহলেই তোমরা সমস্ত-কিছু জয় করতে পারবে।

মা উঠে দাঁড়ালেন, এবার তাহলে আমরা যাই।

শোফি বললো, হ্যাঁ চলো।

চাষীরা তাদের বিদায় দিলো—পরম আত্মীয়কে মানুষ যেমনভাবে বিদায় দেয়।

পথে আসতে আসতে মা বললেন…এ যেন একটা সুন্দর স্বপ্ন। মানুষ আজ সত্য জানবার জন্য উন্মুখ।…উৎসবের দিন, প্রত্যুষে দেখেছি মন্দির জনহীন অন্ধকার…ধীরে ধীরে সূর্যও ওঠে, আলো জাগে, নরনারী সম্মিলিত হয়! এও তেমনি আমাদের প্রত্যুষ—

শোফি বললো, হাঁ, আর আমাদের মন্দির এই সমগ্র পৃথিবী।

—পাঁচ—

এমনি বিচিত্র গতিতে ব'য়ে চললো মা'র জীবন-স্রোত। শোফিও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে দেশময়—দু'দিন থাকে, তারপর কোথায় উধাও হ'য়ে যায়, কেউ টের পায় না, তারপর আবার অকস্মাৎ এসে হাজির হয়। আইভানোভিচ রোজ ভোর আটটায় চা খেয়ে মাকে খবরেব কাগজ পড়ে শোনায়, তারপর ন'টায় আফিসে চলে যায়। মা ঘরের কাজ করেন, বই পড়তে শেখেন। আর ছবির বইয়ের দিকে মনসংযোগ করেন—ছবি দেখতে ভারি ভালো লাগে তাঁর—সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত-কিছু জিনিস তার চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর চলে তাঁর প্রধান কাজ—নিষিদ্ধ পুস্তক এবং ইস্তাহার ছড়ানো। নানা ছদ্মবেশে, নানা স্থানে, নানারকম লোকের সঙ্গে তিনি চলেন, ফেরেন, গল্প করেন, মনের কথা কৌশলে বার করেন। গোয়েন্দারা তাঁকে কোনোদিনও

ধর্‌তে পারেনা। এমনিভাবে ঘোরার ফলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তাঁর কাছে আরো জীবন্ত হ'য়ে উঠলো। দুনিয়ায় অফুরন্ত ধন, আর তার মাঝে মানুষ দরিদ্র···রাশি রাশি অন্ন, আর তার মাঝে মানুষ উপবাসী! ···শত সহস্র জ্ঞানভাণ্ডার, আর তার মাঝে মানুষ নিরক্ষর, শিক্ষাহীন ···মানুষ পথের ধুলোয় বসে হাঁকে, একটি কড়ি ভিখ্ দাও, বাবা—আর তারই সামনে স্বর্ণশীর্ষ, স্বর্ণগর্ভ দেব-মন্দির!···এই সব দেখে দেখে যে মা এতো প্রার্থনাপরায়ণা ছিলেন, তাঁরও যেন ধীরে ধীরে প্রার্থনার প্রতি আগ্রহ ক'মে এলো।

পেভেলের বিচারের তারিখ এখনো স্থির হয়নি। পেভেলের কথা ভেবে মা আর তত আকুল হন না। পেভেলের সঙ্গে সঙ্গে আর সকল শহীদের কথাও তাঁর মনে জাগে—দুঃখের পরিবর্তে জাগে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব গৌরব আর আরব্ধ-ব্রতে নিষ্ঠা।

শশেংকা মাঝে মাঝে দেখা করতে এসে পেভেলের কথা সুধোয়, ব'লে, সে কেমন আছে? আমার কথা জানিয়ো তাকে—তারপর চলে যায়। শশেংকা পেভেলকে ভালোবাসে, মা জানেন। তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

অবসর পেলেই মা বই নিয়ে বসেন।

আইভানোভিচ মার চোখের সামনে এক গৌরবোজ্জল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরে বলে, মানুষ আজ অর্থের কাঙালী, কিন্তু একদিন···যখন অর্থের চিন্তা আর তার থাকবেনা, শ্রম-দাসত্ব থাকবে না, তখন সে চাইবে সোনার চাইতেও বড় সম্পদ—জ্ঞান।

মা মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কবে—কতকাল পরে সে শুভদিন আসবে?

—ছয়—

আইভানোভিচ রোজ সময়মত আফিস থেকে ফেরে। সেদিন সে অনেকটা দেরি করে ফিরলো—আর ফিরলো এক গরম খবর নিয়ে,—কোন একজন মজুর-কয়েদী জেল পালিয়েছে, কে তা জানা যায়নি এখনো।

মার প্রাণ যেন আশায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, কিন্তু কণ্ঠকে জোর ক'রে সংযত ক'রে বললেন, হয়তো পেভেল।

আইভানোভিচ বললো, খুব সম্ভব। আমি রাস্তায় বেড়াচ্ছিলুম দেখতে পাই কি না—বোকামি আর কাকে বলে! যাক্, আবার বেরুচ্ছি।

মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও যাচ্ছি।

হাঁ, তুমি ইয়েগরের কাছে গিয়ে দেখো, সে কিছু জানে কি না।

মা বেশ জোর পায় ইয়েগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দুয়োরের দিকে চেয়ে চোখ তাঁর বিস্ফারিত হল···নিকোলাই না? ঐ তো গেটের কাছে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে! কিন্তু···না, কেউ তো নেই? তবে কি চোখের ধাঁধা! সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আবার থমকে দাঁড়ালেন···মৃদু সন্তর্পিত পদশব্দ··· কিন্তু আবার নিচে চেয়েই মা চীৎকার করে উঠলেন, নিকোলাই, নিকোলাই,—তারপরই ছুটলেন তার দিকে। নিকোলাই হাত নেড়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললো, যাও, যাও,—

মা যেমন নেবেছিলেন, তেমনি উঠে গিয়ে ইয়েগরের ঘরে ঢুকে ফিস্ফাস ক'রে বললেন, জেল পালিয়েছে নিকোলাই।

ইয়েগর হেসে বললো, তোফা। কিন্তু উঠে সম্বর্ধনা করবো এমন শক্তি তো আমার নেই।

বলতে না বলতে পলাতক নিজেই ঘরে এসে ঢুকে দোর বন্ধ করে হাসি মুখে দাঁড়ালো। ইয়েগর বললো, বস ভাই।

নিকোলাই নিঃশব্দে হাসিমুখে মার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বললো, ভাগ্যিস তোমায় দেখলুম, মা। নইলে জেলেই আবার ফিরতুম। শহরের কাউকে আমি চিনিনে; তাই খালি ভাবছিলুম, কেন পালালুম? এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা।

কেমন করে পালালে?

সোফার একপাশে বসে ইয়েগরের হাতে হাত দিয়ে নিকোলাই তার পলায়নকাহিনী ব্যক্ত করে গেলো। ওভারশিয়ারদের ধরে কয়েদীরা ঠ্যাঙাতে শুরু করে···পাগলা-ঘন্টি বেজে ওঠে···গেট খুলে যায়···এই ফাঁকে সে পালায়···তারপর ছন্নছাড়া হ'য়ে ঘুরে বেড়ায় একটা লুকোবার স্থান আবিষ্কার করার জন্য!

পেভেল কেমন আছে?

ভালোই আছে। আমাদের একজন মাতব্বর সে···কর্তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করে···আর সবাই তাকে মানে।···কি খাবো? ভয়ানক ক্ষুধা পেয়েছে।

ইয়েগর বললো, সেলফের ওপর রুটি আছে, ওকে দাও। তারপর বাঁ পাশের ঘরটায় গিয়ে লিউদ্‌মিলাকে ডেকে বল, খাবার নিয়ে আসুক। মা গিয়ে ডাকতেই লিউদ্‌মিলা বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো, কি? অবস্থা খারাপ নাকি?

না, খাবার চাইছে।

চলো—খাবার সময় হয়নি এখনো।

দু'জনে ইয়েগরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই ইয়েগর বললো, লিউদ্‌মিলা ভ্যাসিলিয়েমা, ইনি কর্তাদের হুকুম না নিয়ে জেল থেকে চলে এসেছেন—পয়লা একে কিছু খেতে দাও, তারপর, একে দিন-দু'তিন লুকিয়ে রাখো।

লিউদ্‌মিলা মাথা নেড়ে রোগীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, তা' রাখছি কিন্তু মুখটা থামাও দেখি, ইয়েগর। জানো, এ তোমার পক্ষে ক্ষতিকর! ওরা আসামাত্র আমায় খবর দেওয়া উচিত ছিল। আর দেখছি ওষুধও খাওনি—এসব গাফেলি করার মানে কি? ওষুধ এক ডোজ খেলে একটু আরাম বোধ কর, এতো তুমি নিজেই বলো···তোমরা আমার ঘরে এসো···এ হাসপাতালে যাবে।

ইয়েগর বললো, হাসপাতালে না পাঠিয়ে ছাড়বে না তাহ'লে?

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

অর্থাৎ হাসপাতালে গিয়েও তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই!

বোকোনা বলছি।

তারপর ইয়েগরের বুকে কম্বলটা টেনে দিয়ে শিশিতে ওষুধ কতটা আছে দেখে মার দিকে ফিরে বললো, আমি চললুম একে নিয়ে। তুমি ইয়েগরকে এক দাগ ওষুধ দিয়ো।···কথা বলতে দিয়ো না।

তারা চলে যেতেই ইয়েগর বললো, চমৎকার মহিলাটি। ওর সঙ্গে যদি কাজ করতে, মা! ওই আমাদের কাগজপত্র সব ছাপিয়ে দেয়।

চুপ, ওষুধ খাও।—

ইয়েগর ঢক ঢক ক'রে ওষুধ গিলে বললো, মরব ঠিকই, মা, কথা না বললেও। আর তার জন্য কুচপরোয়া নেই···বাঁচার আনন্দের সঙ্গে মরার বাধ্য-বাধকতা থাকবেই।

কথা কয়োনা।

কথা কবো না? বলো কি, মা। চুপ ক'রে থেকে লাভ? মাত্র কয়েক সেকেণ্ড বেশি বেঁচে থাকবো···বেশি দুঃখ সইবো। আর হারাবো সুলোকের সঙ্গে কথা কইবার আনন্দ। পরলোকে কি আর এমন কথা কইবার লোক খুঁজে পাবো, মা!

চুপ কর, ঐ মহিলাটি এসে এর জন্য আমায় বকবেন।

মা, ও আমাদের দলেরই একটি কর্মী। বকবে ও তোমায় নিশ্চয়ই। কারণ বকা ওর অভ্যাস।

লিউদ্‌মিলা এসে ঘরে ঢুকে দোর ভেজিয়ে বললো, নিকোলাইর পোশাক বদলে এক্ষুণি এস্থান ত্যাগ করা দরকার। এক্ষুণি গিয়ে পোশাক নিয়ে এসো।

মা কাজ পেয়ে খুশি হ'য়ে পথে বেরোলেন। তারপর ধারে-কাছে স্পাই আছে কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে গাড়ি ক'রে বাজারে গেলেন। পলাতকের পোশাক বদলি করার জন্য কেউ কাপড় কিনতে আসে কিনা তা লক্ষ্য করার জন্যই স্পাই ঘুরছিল বাজারে। মা তাদের চোখে ধুলি দিয়ে পোশাক কিনলেন, আর কেবল বগর-বগর করতে লাগলেন···এমন লোক নিয়েও পড়েছি, খালি মদ, খালি মদ···আর মাস গেলেই এক-এক সুট পোশাক। পুলিস ভাবলো, ওর মাতাল স্বামীর জন্য পোশাক কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

পোশাক এনে নিকোলাইর ভেল বদলে তাকে নিয়ে মা আবার রাস্তায় বেরুলেন। তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে বাড়ি ফিরে চললেন।

পথে খবর পেলেন ইয়েগরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অবস্থা

সংকটাপন্ন। তাঁর যাওয়া দরকার। মা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শুনলেন, ইয়েগর ডাক্তারকে বলছে, আরোগ্য হচ্ছে এক রকম সংস্কার! নয় কি, ডাক্তার?

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, বাজে বোকোনা।

ইয়েগর বললো, কিন্তু আমি বিপ্লবী···আমি সংস্কারকে ঘৃণা করি।

মা দেখলেন, ডাক্তারও তাদেরই একজন সহকর্মী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল।

ইয়েগরকে আধা-শোয়া অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এবার সে বলে উঠলো, ও,···বিজ্ঞান···আর পারিনে—একটু শুই, ডাক্তার?

না।

তুমি গেলেই শোবো।

ডাক্তার মাকে বললো, দিয়োনা যেন শুতে। শুলে ওর ক্ষতি হ'বে।

ডাক্তার চলে যেতে ইয়েগর ধীরে ধীরে চোখ না খুলে বলে যেতে লাগলো, মরণ যেন আমার দিকে এগোচ্ছে আস্তে আস্তে—অনিচ্ছার সঙ্গে···আমার জন্য যেন ওর দরদ জাগছে···'আহা এমন সুন্দর অমায়িক লোক তুমি···'

চুপ করো, ইয়েগর।

একটু সবুর কর, মা, শীগগিরই চুপ করবো, চিরদিনের মতো চুপ করবো।···

তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তবু···ধীরে ধীরে, একটু একটু করে বলতে লাগলো সে,···তোমার সঙ্গ চমৎকার লাগছে, মা···তোমার চোখ, তোমার মুখ, তোমার ভাবভঙ্গি অতি সুন্দর···কিন্তু এর পরিণাম?—অন্তরকে প্রশ্ন করি।—ভাবতে দুঃখ লাগে—কারাগার, নির্বাসন, নিষ্ঠুর

অত্যাচার অন্যান্য সবাইর মতো তোমারও অপেক্ষা করছে।...মা, তুমি কারাগারকে ভয় কর ?

না।

কর না ? কিন্তু কারাগার সত্যিই নরক। এই কারাগারই আমায় মরণ-আঘাত দিয়েছে, মা।...সত্যি কথা বলতে কি, আমি মরতে চাইনে, মা—আমি মরতে চাইনে।

মা সান্ত্বনা দিতে গেলেন, এখনই মরার কি হয়েছে ; কিন্তু ইয়েগরের মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো যেন জমে গেলো মুখে।

ইয়েগর বলতে লাগলো, অসুখ না হলে আজও কাজ করতে পারতুম। কাজ যার নেই...জীবন তার লক্ষ্যহীন...বিড়ম্বনা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ছেয়ে এলো। মা কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে দুয়োর বন্ধ করার মৃদু শব্দে জেগে উঠে বললেন কোমলকণ্ঠে, ঐ যা, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। মাপ করো।

ইয়েগরও তেমনি কোমল কণ্ঠে জবাব দিলো, তুমিও মাপ কোরো।

হঠাৎ তীব্র আলো ফুটে উঠলো ঘরে—লিউদ্‌মিলা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরে, বলছে, ব্যাপার কি ?

মার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে জবাব দিলো ইয়েগর, চুপ।

মুখ হা করে খুলে মাথা উঁচু করলো সে। মা তার মাথাটা ধরে মুখের দিকে চাইলেন। সে মাথাটা সজোরে ছিটকে নিয়ে বলে উঠলো, বাতাস...বাতাস। তার শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ভেঙে পড়লো কাঁধের ওপর। উন্মুক্ত চোখের মধ্যে প্রতিফলিত হল দীপের শুভ্র শিখা। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়েগর, বাপ আমার !

লিউদ্‌মিলা জানালার কাছে গিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে বললো, আর কাকে ডাকছো, মা!

মা নুয়ে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

—সাত—

তারপর ইয়েগরকে বালিশের ওপর শুইয়ে দিয়ে, তার হাত দু'খানা ভেঙে বুকের ওপর রেখে মা লিউদ্‌মিলার কাছে এসে তার ঘন চুলে হাত বুলোতে লাগলেন। লিউদ্‌মিলা কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো···অনেকদিন ধরে জানতুম ওকে। একসঙ্গে নির্বাসনে ছিলুম,—এক সঙ্গে হেঁটেছি··একসঙ্গে কারাবাস করেছি। মাঝে মাঝে বিপদ এসেছে, দুঃখ এসেছে, বহু লোক হতাশ হয়ে পড়েছে·· কিন্তু ইয়েগরের আনন্দের কম্‌তি ছিল না কখনো। হাসি-কৌতুকের প্রলেপ দিয়ে সে বেদনাকে ঢাকতো—দুর্বলকে বল দিতো। সাইবেরিয়ায়··অলস জীবন যেখানে মানুষকে করে তোলে নিজের ওপর বিতৃষ্ণ,···সেখানেও সে ছিল দুঃখ-সঙ্গী···যদি জানতে কতবড় সঙ্গী ছিল সে! নির্যাতন অনেক সয়েছে, কিন্তু কেউ কখনো অভিযোগ করতে শোনেনি তাকে। আমি তার কাছে বহুঋণে ঋণী—তার মনের কাছে ঋণী···তার অন্তরের কাছে ঋণী। বন্ধু···সঙ্গী···প্রিয় আমার!···বিদায়···বিদায়···তোমার চিহ্নিত পথে চলবো আমি···সন্দেহে না টলে···সমস্ত জীবন···বিদায় বন্ধু, বিদায়!

লিউদ্‌মিলা মৃতের পায় মাথা লুটিয়ে দিলে।

পরদিন অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হ'ল। আইভানোভিচ, শোফি, মা চায়ের টেবিলে বসে গম্ভীরভাবে ইয়েগরের কথা আলোচনা করছেন।

হঠাৎ আবির্ভূত হল শশেংকা, অন্ধকারের বুকে একটা দীপ্ত মশালের মতো। আনন্দ-উজ্জ্বল তার মূর্তি।

ইয়েগরের মৃত্যুর কথা সে জানেনা। এইদিন তার এই আনন্দকে অন্যায় মনে ক'রে সবাই বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললো, আমরা ইয়েগরের কথা বলছিলাম।...

শশেংকা বললো, ইয়েগর?...চমৎকার লোক। নয়? বিনয়ী... নিঃসন্দিগ্ধ...দুঃখজয়ী ..চির-কৌতুকোচ্ছল...রসিক......সুকর্মী...বিপ্লবচিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত, বিদ্রোহ-দর্শন রচনায় সুদক্ষ। কী সোজা সরল ভাষায় মিথ্যা এবং অত্যাচারকে সে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলে...ভীষণের সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে কী অপূর্ব কৌশলে বাস্তবকে করে তোলে আরো ভীষণ, আরো হৃদয়গ্রাহী। আমি তার কাছে ঋণী...তার হাসিমুখ, তার কৌতুক, বিশেষ ক'রে সন্দেহক্ষণে তার সেই আশ্বাসবাণী...তা' আমি কখনো ভুলবোনা...আমি তাকে ভালবাসি।

শোফি বললো, সেই ইয়েগর আজ মৃত।

মৃত!...শশেংকা চমকে উঠলো। তারপর বললো, ইয়েগর মৃত... একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত।

আইভানোভিচ মৃদুহাস্যে বললো, কিন্তু এ সত্য কথা, সে মরেছে।

শশেংকা ঘরের এদিক-ওদিক পাইচারি করে হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক সুরে বলে উঠলো, মরেছে অর্থ কি? কি মরেছে? ইয়েগরের ওপর আমার ভক্তি? তার প্রতি আমার প্রেম? আমার বন্ধুত্ব? তার প্রতিভা? তার বীরত্ব? তার কর্ম? মরেছে এই সব? মরেনি, মরতে পারে না। তার যত কিছু ভালো, আমি জানি, তা আমার কাছে কখনো মরবেনা! একটা মানুষকে 'মরেছে' বলে বিদায় করে দিতে

আমাদের একটুও দেরি হয় না—তাই আমরা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাই যে মানুষ কখনো মরেনা, যদি না আমরা ইচ্ছে করে বিস্মৃত হই, তার মনুষ্যত্বের গৌরব, সত্য এবং সুখকল্পে তার আত্মত্যাগী চেষ্টা,—ভুলে যাই, জীবন্ত যাদের প্রাণ তাদের মধ্যে সকল জিনিস সর্বকালে চিরজীবী হয়ে থাকে। চিরজীবী, চির-ভাস্বর আত্মাকে তার দেহের সঙ্গে সঙ্গে এতো তাড়াতাড়ি মাটি-চাপা দিয়োনা, বন্ধু···

কথাপ্রসঙ্গে পেভেলের কথা উঠলো। শশা বললো, সে সঙ্গীদের চিন্তাতেই সদা-বিব্রত। বলে কি জানো? সঙ্গীদের জেল-পালানোর বন্দোবস্ত করা দরকার এবং তা নাকি খুবই সোজা।

শোফি বললো, তুমি মনে কর, শশা, সত্যি সম্ভব এ?

মা চায়ের কাপ টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে কেঁপে উঠলেন। শশার মুখ বিবর্ণ, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তারপর হেসে বললেন, পেভেল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ—আর সে যা বলে তা যদি ঠিক হয়, তবে চেষ্টা করা আমাদের উচিত, আমাদের কর্তব্য।

শ্রোতাদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শশা বেশ একটু আহত হয়ে বললো, তোমরা ভাবছ, আমার এতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আছে!

শোফি বললো, সে কি শশা?

পাংশুমুখে শশা বললো, হাঁ, তোমরা যদি এর বিবেচনা করার ভার নাও, তাহ'লে আমি কোনো কথা কইবো না।

আইভানোভিচ বললো, পালানো সম্ভব হ'লে সে সম্বন্ধে দু'মত থাকতে পারে না; কিন্তু সবার আগে আমাদের জানা চাই, বন্দী বন্ধুরা এ চান কিনা!

মা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, তারা কি মুক্তি চাইবেনা, এওকি সম্ভব?

আইভানোভিচ বললো, পরশু পেভেলের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা চিঠি দিয়ো…তাদের মত আমরা জানি আগে…

মা বললেন, তা পারবো।

শশা উঠে চলে গেলো ধীর মন্থর পদে…শুষ্ক চোখে।

মা কান্নার সুরে বলে উঠলেন, একটিবার, একটি দিনের জন্য যদি ওদের দু'হাত এক করতে পারতুম!

—আট—

পরদিন ভোরে হাসপাতালের সামনে লোকে লোকারণ্য, মৃত বীরের শবদেহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যেতে এসেছে সবাই। জনতা নিরস্ত্র, আর তাদের মধ্যে শান্তি-রক্ষা করতে এসেছে পুলিস রিভলবার, বন্দুক, সঙিন নিয়ে।

গেট খুলে গেলো…তারপর বেরিয়ে এলো শবাধার…ফুলের মালায় সাজানো…লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। সবাই নীরবে টুপি খুলে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, এমন সময় এক লম্বাপানা পুলিস অফিসার একদল সৈন্য নিয়ে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে শবাধারটি ঘিরে ফেলে হুকুম দিলেন, ফিতে সরিয়ে ফেল!

মৃতের প্রতি এই অসম্মানের সূচনায় জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। পুলিস অফিসারটি তা গ্রাহ্য না ক'রে সুর চড়িয়ে হুকুম দিলেন, ইয়াকোলেভ, ফিতে কেটে ফেল।

হুকুমমাত্র ইয়াকোলেভ তরবারি কোষমুক্ত ক'রে ফিতে কেটে ফেললো। জনতা নেকড়েদলের মতো গর্জন ক'রে উঠলো। পুলিসের

সঙ্গে মারামারি বাধে আর কি! নায়করা কোন মতে থামিয়ে রাখলো। লোকদের বললো, বন্ধুগণ, এখন আমাদের সব সয়ে যেতে হবে—যে পর্যন্ত-না আমাদের দিন আসে!…

শোভাযাত্রা গোরস্থানে প্রবেশ করলো। সবাই নীরব, নিঃশব্দ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলো একটি যুবক, সদ্য-প্রস্তুত কবরের ওপর দাঁড়িয়ে সে শুরু করলো, সঙ্গিগণ!…

পুলিস অফিসারটি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, পুলিস সাহেবের হুকুম, বক্তৃতা করা নিষেধ।

যুবকটি বললো, আমি মাত্র দু-চারটি কথা বলব। সঙ্গিগণ, আমাদের এই শিক্ষক এবং বন্ধুর কবরের ওপর দাঁড়িয়ে এস আজ আমরা নীরবে এই শপথ করি যে, আমরা এঁর অভিলাষ ভুলবো না, প্রত্যেকে অবিশ্রান্তভাবে খনন করতে থাকবো এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের কবর, যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের দুশমন।…

পুলিস অফিসার হুকুম দিলেন, গ্রেপ্তার কর ওকে।

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেলো জনতার উন্মত্ত চিৎকারে, 'স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র নিপাত যাক্' 'দীর্ঘজীবী হ'ক স্বাধীনতা' 'আমরা তার জন্য বাঁচব, তার জন্য প্রাণ দেব।'

তৎক্ষণাৎ পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়লো অস্ত্র হাতে নিরস্ত্র জনতার ওপর। মাও সেখানে ছিলেন। দেখলেন, মার খেয়েও জনতা সেই বক্তা যুবকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন ছিনিয়ে নেবে পুলিসের হাত থেকে। পুলিস তাকে ঘিরে রয়েছে…জনতার ওপর সঙিন চলছে, তলোয়ার চলছে,… রক্তে গোরস্থান লাল হ'য়ে উঠেছে…যুবক তখন মিনতি করে বললো, ভাইসব, শান্ত হও, আমি বলছি, আমায় যেতে দাও।…

তার কথায় জন-সমুদ্র স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। তারপর এক-এক করে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চলে যেতে লাগলো। শোফি একটা আহত ছেলেকে এনে মার কাছে দিলো, বললো, শীগগির একে নিয়ে ভাগো এখান থেকে।

ছেলেটির নাম আইভান। মা আহত আইভানকে একটা গাড়ি করে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

———

—নয়—

আগের সেই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আইভানের সেবা-শুশ্রূষার রীতিমতো বন্দোবস্ত করে কর্মীরা কাজের কথা পাড়লো।

ডাক্তার বললো, প্রচার-কার্য আমাদের খুবই কম চলছে। ওটা বেশ জোরে এবং ব্যাপকভাবে শুরু করা দরকার।

আইভানোভিচ সে কথায় সায় দিয়ে বললো, চারদিক থেকেই বইয়ের তাগিদ আসছে, অথচ আজো একটা ভালো ছাপাখানা হল না আমাদের। লিউদ্‌মিলা খেটে খেটে মরছে—তাও একজন সাহায্যকারী দরকার।

শোফি বললো, কেন, নিকোলাই ?

শহরে সে থাকতে পারবে না। নতুন ছাপাখানাটা হলে সেখানে সে ঢুকে পড়বে,—সেখানেও আর একজন লোক লাগবে।

মা বলে উঠলেন, আমি হ'লে চলে না ?

শহরের বাইরে থাকতে হবে, মা, পেভেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না এতো···তোমার কষ্ট হবে।

হ'ক। আমি যাবো, রাঁধুনীর কাজ করবো।

শহরের উত্তেজনা আর ভালো লাগছিল না বলে মা এই কাজ বেছে নিলেন

পরদিন জেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হাতের মুঠোয় ছিল ছোট ক'রে ভাজ-করা চিঠি। হ্যাণ্ডসেক করার সময় পেভেলের হাতে তা গুঁজে দিলেন।

বাড়ি এসে শশার সঙ্গে দেখা। মার কাছে পেভেলের খবর নিয়ে শশা বললো, তুমি কি মনে কর, মা, সে রাজি হবে ?

জানিনে—হবে বোধহয়। বিপদই যদি না থাকে তো আর কি আপত্তি থাকতে পারে !

শশা, ধীর করুণ-কণ্ঠে বললো, আমি জানি, সে রাজি হবে না। তোমার কাছে মিনতি, মা—তাকে মত করিয়ে বলো, তাকে দরকার, তাকে নইলে কাজ চলবে না···তার আসা চাই-ই···

মা শশাকে কোলে টেনে বললেন, সে কি কারো কথা শোনে; মা ?

ঠিক বলেছো, মা, শোনে না···চল রোগীকে খেতে দিইগে।

মা এসে আইভানের পাশে ব'সে গল্প জুড়ে দিলেন। আইভান মাকে চিনতো না। কথায় কথায় বললো, পেভেলের কথা শুনেছো ?—সে-ই সর্বপ্রথম আমাদের নিশান উড়িয়েছে প্রকাশ্যে—আর তার মা··· তিনিও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তারপর···অদ্ভুত রমণী তিনি।

মা একটু হাসলেন। বললেন, খাও দেখি আরো। যত তাড়াতাড়ি ভালো হ'য়ে যাবে, তত তাড়াতাড়ি কাজে লাগতে পারবে। দেশ আজ চায় সবল হাত, শুদ্ধ হৃদয়, সাধু মন।···

সন্ধ্যার সময় শোফি বললো, একবার গ্রামে যেতে হ'বে, মা।

কেন বলোতো? কখন যেতে হবে?

কাল। গাড়ি ক'রে ভিন্ন এক পথ দিয়ে যেয়ো। সেখানে খুব ধর-পাকড় হয়েছে। তবে রাইবিন যে পালাতে পেরেছে এটা এক রকম নিশ্চিত।...কিন্তু আমাদের থামলে চলবে না...নিষিদ্ধ পুস্তিকা ছড়িয়ে যেতেই হবে। পারবে? ভয় পাবেনা তো?

মা দস্তুরমতো আহত হয়ে বললেন, ও প্রশ্ন করো না, ভয় আর কিছুতেই পাইনে আমি। কিসের জন্যে পাবো? কি আছে আমার? একটি মাত্র ছেলে। তার জন্যই ছিল যত ভাবনা, যত ভয়। এখন আর কি।...

শোফি বললো, মাপ করো, মা। আর অমন কথা বলবো না কখনো।

—দশ—

পরদিন প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গাড়োয়ানের সঙ্গে কত-কি কথা কইতে কইতে মা রওয়ানা হলেন গ্রামের দিকে। বিকালবেলা নিকোলস্ক পৌছুলেন।

নিকোলস্ক একটি গণ্ডগ্রাম। একটা সরাইয়ে ঢুকে মা চায়ের অর্ডার দিয়ে জানালার কাছে বেঞ্চিতে বসে বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে রইলেন। বাগানের গায়েই টাউন-হল। তার সিঁড়ির ওপর বসে একজন চাষী ধূমপান করছে।

হঠাৎ গ্রামের সার্জেণ্ট জোর ঘোড়া ছুটিয়ে টাউন-হলের সামনে এসে উপস্থিত হল; তারপর হাতের চাবুকটা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে চাষীকে কি বললো। চাষী উঠে হাত বাড়িয়ে কি একটা দেখালো। সার্জেণ্ট

তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে মাটিতে নাবলো, তারপর চাষীর হাতে ঘোড়ার লাগামটা দিয়েই টাউন-হলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলো না।

সরাইর একটি মেয়ে পরিচারিকা কাপ-প্লেট এনে টেবিলের ওপর রেখে সোৎসাহে বলে উঠলো, একটা চোর ধরেছে এইমাত্র। নিয়ে আসছে এখানে।

মা বললেন, সত্যি? কি রকম চোর বলতো?

জানিনে।

কি চুরি করেছিলো?

কে জানে? শুনলুম তাকে ধরেছে। চৌকিদার ছুটে পুলিস কমিশনারের কাছে গেলো।

মা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলেন, টাউন-হলের সিঁড়ির ওপর চাষীরা জড়ো হচ্ছে দলে দলে…সবাই চুপ-চাপ। মা বইয়ের ব্যাগটা বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে রেখে শালটা মাথায় জড়িয়ে সরাই থেকে বেরিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়াতেই তাঁর শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে এলো…শ্বাস রুদ্ধ…পা অসাড়। বাগানের মাঝখানে রাইবিন, পিঠ-মোড়া করে হাত বাঁধা…তু'পাশে তু'জন পুলিস!

মা স্থান-কাল-পাত্রের কথা বিস্মৃত হ'য়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাইবিনের দিকে। রাইবিন কি যেন বললো, কিন্তু তা মার কানে গেলো না! মার কাছেই দাঁড়িয়েছিল একজন চাষী…নীল তার চোখ…মা তাকে জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছে?

ঐ তো দেখছো।

একটি রমণী চীৎকার করে উঠ্লো, উঃ, কী ভীষণ দেখতে চোরটা!

রাইবিন মোটা গলায় বলে উঠলো, চাষী বন্ধুগণ, আমি চোর নই। আমি চুরি করিনে, আমি কারও ঘরদোরেও আগুন লাগাইনে। আমি শুধু যুদ্ধ করি মিথ্যার বিরুদ্ধে। তাই ওরা আমাকে ধরেছে। তোমরা কি শোনোনি সে-সব বইয়ের কথা, যার মধ্যে আমাদের চাষীদের সম্বন্ধে সত্য কথা বলা হয়েছে? আমি তাই ছড়িয়েছি চাষীদের মধ্যে। তারই জন্য আমার এ শাস্তি।

জনতা রাইবিনের দিকে চেপে দাঁড়ালো। রাইবিন উচ্চকণ্ঠে বললো, চাষীবন্ধুগণ, এই বইগুলোতে বিশ্বাস করো। এর জন্য আমায় হয়তো আজ প্রাণ দিতে হবে। কর্তারা আমাকে মেরেছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে, কোত্থেকে আমি এ বইগুলি পাই তা জানার জন্য—আরো মারবে। কেন জানো? এই বইয়ের মধ্যে সত্য কথা লেখা হয়েছে। খাঁটি পৃথিবী আর সাঁচ্চা বাত—তার কদর রুটির চাইতে বেশি—এই হচ্ছে আমার কথা।

চাষীরা কথাগুলো শুনছে, কিন্তু তাদের মনে কেমন যেন একটা ভয়, কেমন যেন একটা সন্দেহ। একজন বললো, এসব ব'লে কেন মিছামিছি নিজের অবস্থা কাহিল করছে।

সেই নীলচোখ চাষীটি জবাব দিলো, ওতো মরতেই চলেছে, তার চাইতে তো আর কাহিল করতে পারবে না!

সার্জেণ্ট হঠাৎ আবির্ভূত হ'ল, এতো লোক কিসের? কে বক্তিমে করছে?

তারপর রাইবিনের দিকে এগিয়ে তার চুল ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো, তুই বক্তিমে করাছিস? পাজি, গুণ্ডা কোথাকার, তুই বক্তিমে করছিস?

জনতা তখনও শবের মতো শান্ত...মার বুকে অক্ষম বেদনার জ্বালা।

একজন চাষী ফেললো দীর্ঘনিশ্বাস। রাইবিন আবার ব'লে উঠলো, দেখছো তো, ভাইসব ?

চুপ, ব'লে সার্জেণ্ট তার মুখে এক ঘা দিলো।

রাইবিন ঘুরে পড়ে বললো, ওরা শুধু এমনি করে মানুষের হাত বেঁধে মারে, যা খুশি ক'রে নেয়।

ধরো ব্যাটাকে। ভাগ্ ব্যাটারা—ব'লে সার্জেণ্ট রাইবিনের সামনে লাফিয়ে প'ড়ে উপর্যুপরি ঘুষি চালাতে লাগলো, মুখে, বুকে, পেটে।

একবার জনতার যেন ধৈর্যচ্যুতি হ'ল।

মেরোনা।…মারছো কেন ? অকেজো পশু কোথাকার!…ছিনিয়ে নিয়ে চলো ওকে।…

সেই নীল-চোখ চাষীটি রাইবিনকে সঙ্গে নিয়ে চললো টাউন-হলের দিকে। সার্জেণ্ট গর্জন ক'রে উঠলো, খবর্দার, নিয়ে যেয়োনা।…

নীল-চোখ চাষীটি জবাব দিলো, না, নোব ; নইলে তোমরা একে মেরে ফেলবে।

রাইবিন এবার বেশ জোর গলায় বললো, চাষীবন্ধুগণ, তোমরা কি বুঝতে পারছো না, কী শোচনীয় তোমাদের জীবন ? তোমরা কি বুঝতে পারছো না, ওরা কেমন ক'রে তোমাদের লুণ্ঠন করে—প্রতারণা করে—রক্ত পান করে ? এই দুনিয়াকে রক্ষা করছে কারা—তোমরা। কাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্ব-ব্যাপী সভ্যতা ?—তোমাদের ওপর। বিশ্বের সমস্ত-কিছুর মূলীভূত শক্তি কাদের মধ্যে ?—তোমাদের মধ্যে। কিন্তু সেই তোমরা কি পেয়েছো ?…পেয়েছো উপবাস। ওই তোমাদের একমাত্র পুরস্কার।…

যথার্থ কথা! আরো ব'লো, আরো ব'লো, তোমার গায়ে হাত তুলতে দেবো না। ওর হাত খুলে দাও।

না, থাক।

খুলে দাও বলছি।

পুলিসরা ভয়ে হাত খুলে দিয়ে বললো, শেষটা পস্তাবে!

রাইবিন বললো, ভাই সব, আমি পালাবো না। পালিয়ে আমি আত্ম-গোপন করতে পারি কিন্তু সত্যকে কেমন ক'রে গোপন করবো? সে যে এইখানে···আমার অন্তরে।

জনতা এবার যেন গরম হ'য়ে উঠলো। রাইবিন তার রক্ত-মাখা হাত দু'খানা ঊর্ধ্বে তুলে বলতে লাগলো, ভাইসব, আমি দাঁড়িয়েছি তোমাদেরই জন্য···তোমাদেরই দাবি নিয়ে। এই দেখ আমার রক্ত—সত্যের জন্য এ রক্তপাত হয়েছে।···সেই সত্যের দিকে তোমরা নজর রেখো, সেই বই পড়ো। কর্তারা, পুরুতরা বলবে···আমরা নাস্তিক, ধ্বংসবাদী···তাদের কথায় বিশ্বাস কোরো না। সত্য চলেছে পৃথিবীর বুকের ওপর গোপন-পদসঞ্চারে, মানুষের মধ্যে খুঁজছে সে নীড়। কর্তাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে অগ্নি-তপ্ত ছুরিকার মতো···তারা একে সইতে পারে না···এ তাদের কেটে—পুড়িয়ে দিয়ে যাবে।···এ তাদের মরণ-শত্রু; তাই এর গতি গুপ্ত। কিন্তু এই সত্যই তোমাদের পরম মিত্র।

সাঁচ্চা কথা।···কিন্তু ভাই এর জন্য তোমার সর্বনাশ হ'বে।···

কে ধরিয়ে দিলো এঁকে?

একজন পুরুত···একটি পুলিস বললো।

এমন সময় পুলিস-সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। জনতা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকে পথ করে দিলো। সাহেব এসেই রাইবিনের

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, ব্যাপার কি? এর হাত বাঁধা নেই কেন?…এই বাঁধো…

একজন পুলিস বললে, বাঁধাই ছিলো হুজুর, ওরা খুলে দিলো।

সাহেব জনতার দিকে চেয়ে হুমকি দিয়ে বললেন, ওরা কারা? কোথায় সে লোক?…তুমি? সুমাখভ্ ব'লে সেই নীল চোখ চাষীটির বুকে তরবারির মুঠো দিয়ে দিলেন এক ঘা। আর তুমি…মিশিন বলে, আর একজনের দাড়ি ধরে দিলেন টান। তারপর বাকি লোকগুলোকে তাড়া দিয়ে বললেন, ভাগ্ ব্যাটারা…সাহেব যে খুব অগ্নি-শর্ম্মা হ'য়ে উঠলেন তা নয়, সব যেন তিনি যন্ত্রের মত করে যাচ্ছেন।

জনতা পালালো না, শুধু খানিকটে সরে সরে দাঁড়ালো।

সাহেব পুলিসটির দিকে চেয়ে বললেন, কিহে, হাত বাঁধছো না যে? ব্যাপার কি?

জবাব দিলো রাইবিন, আমি হাত বাঁধতে দিতে চাইনে। কেন বাঁধবে? পালাচ্ছিওনে, লড়াইও করছিনে।

সাহেব তার দিকে এগিয়ে বল্‌লেন, কি বলছো?

রাইবিনও চড়া গলায় জবাব দিলো, বলছি, তোমরা পশু—তাই মানুষকে এমনভাবে নির্যাতিত কর। কিন্তু সাবধান, সেই রক্ত-দিবস অচিরেই আসছে।…সেই দিন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হবে এর।

কী! কি বললি পাজি, বদমাস। কি বললি—বলে সাহেব রাইবিনের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলেন।

রাইবিন তার দিকে মুখ তুলে বললো, ঘুষি দিয়ে সত্যকে বধ করা যায় না, কর্তা!…আমি জানতে চাই, কোন্ অধিকারে কুকুরের মতো কামড়াচ্ছো আমায়?

সাহেব আর এক ঘুষি ছুঁড়লেন, কিন্তু রাইবিন চকিতে সরে দাঁড়াতে সাহেব প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জনতার মধ্যে হাসির হর্‌রা বয়ে গেল। রাইবিন গর্জন করে বললো, খবর্দার, নরকের পশু…গায়ে হাত তুলিসনি…আমি তোর চেয়ে দুর্বল নই…চেয়ে দেখ্…

সাহেব দেখলেন গতিক বড় ভাল নয়। লোকগুলো ক্রমশ ঘনিয়ে আসে তার দিকে। তখন এদিক-ওদিক চেয়ে ডাকলেন, নিকিতা!

ভিড় ঠেলে গাট্টা-গোট্টা চেহারার একটি চাষী এসে সাহেবের সামনে দাঁড়ায়।

এই ব্যাটার কান প্যাঁচিয়ে বেশ একটা নম্বরি ঘুষি চালাও তো।

চাষীটি রাইবিনের সামনে গিয়ে ঘুষি পাকালো। রাইবিন নড়লোনা একটুকুও। সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে প্রগাঢ় স্বরে বললো, দেখ ভাইসব, পশুরা কেমন ক'রে আমাদের হাত দিয়েই আমাদের কণ্ঠরোধ করে। দেখ, দেখ…একবার ভাব…কেন এ আমাকে মারতে চায়? কেন?…বলতে বলতে নিকিতার ঘুষি এসে পড়লো তার মুখে।

জনতা কোলাহল ক'রে উঠলো,—নিকিতা, পরকালের কথা একেবারে ভুলে ব'সে আছিস বুঝি!

সাহেব নিকিতার ঘাড়ে ঠ্যালা দিয়ে বলে, আমার হুকুম, মারো।

নিকিতা একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে গম্ভীরভাবে বললো, আমি আর পারবোনা।

কী?

সাহেব রেগে আগুন হ'য়ে নিজেই রাইবিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর দু'ঘুষিতে রাইবিনকে মাটিতে ফেলে বুকে, পাশে, মাথায় লাথি ছুঁড়তে লাগলেন। জনতাও পলকে উত্তেজিত হ'য়ে হুংকার দিয়ে এগিয়ে

এলো সাহেবের দিকে। সাহেব ব্যাপার দেখেই তরবারি হাতে নিয়ে বলে উঠল, বটে, দাঙ্গা করছো, তোমরা দাঙ্গা করছো?…তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে অবস্থার গতিক দেখে বলে, বেশ, নিয়ে যাও, ছেড়ে দিচ্ছি; কিন্তু জেনে রেখো, এ একজন রাজনৈতিক আসামী…জারের বিরুদ্ধে…একে তোমরা আশ্রয় দিচ্ছো…তোমরাও তাহলে বিদ্রোহী…

জনতা এ কথায় ভয়ানক দমে গেলো।…তাদের সে উত্তেজনা দূর হ'য়ে স্বরে ফুটে উঠলো যেন মিনতির ভাব। বলতে লাগলো, দোষ করেছে…আদালতে নিয়ে যাও… মেরোনা…মাপ কর ওকে…এসব অত্যাচারের অর্থ কি? দেশে কি এখন বে-আইনের রাজত্ব?…এমনি ক'রে সবাইকে ঠ্যাঙাতে শুরু করলেই হয়েছে আব কি…শয়তানের দল, খালি মারধর শিখেছে।…

জন-কয়েক চাষী রাইবিনকে মাটি থেকে তুললো। পুলিসরা আবার তার হাত বাঁধতে গেলো।

জনতা বাধা দিয়ে বললো, একটু সবুরই কর না!

রাইবিন হাত দিয়ে রক্ত মুছে দাঁড়াতেই দেখলো, মা…ভিড়ের মধ্যে। মার সঙ্গে ইঙ্গিত-বিনিময় ক'রে পাশে-দাঁড়ানো সেই নীল-চোখ চাষীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে রাইবিন। তারপর জনতাকে সম্বোধন করে বলে উঠলো, সাহস এবং আশা-ভরা কণ্ঠে: বন্ধুগণ, কোন ভয় নেই। আমি দুনিয়ায় একা নই। সকল সত্যকে ওরা গ্রেপ্তার করতে পারবে না…আমি যাবো, কিন্তু আমার স্মৃতি থাকবে…একটি নীড় ওরা নষ্ট ক'রে দেয়, দিক …আরো বহু নীড়, বহু বন্ধু, বহু সঙ্গী আছে আমার…তারা সত্যের নব নব নীড় রচনা করবে।…তারপর একদিন বেরোবে তারা মুক্তির অভিযানে। মানুষকে করবে মুক্তি-প্রভায় সমুজ্জ্বল।

সাহেবের স্বর তখন অনেকটা নরম হ'য়ে এসেছে···বলে, আমি মেরেছি বলেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে হাত তুলবে? এতো সাহস তোমাদের?

কেন?···তুমি কোন্ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছো?···রাইবিন জবাব দিলো। তারপরই আবার শুরু হল জনতার কোলাহল।

তর্ক কোরোনা।···তুমি কাদের বিরুদ্ধে লেগেছো, জানো?—সরকারের।

রাগ করবেন না হুজুর। ওর মাথার ঠিক নেই।

শহরে নিয়ে যাবে তোমায়।

সেখানে সুবিচার পাবে।

পুলিসরা রাইবিনকে নিয়ে টাউন-হলের মধ্যে চলে গেলো। চাষীরাও যে যার বাড়ি চলে গেলো।

তারপর একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো টাউন-হলের সামনে। রাইবিনকে হাত-বাঁধা অবস্থায় এনে ঠেলে ভ'রে দেওয়া হলো তার মধ্যে। রাত্রির সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে বেজে উঠলো রাইবিনের কণ্ঠস্বর: বিদায়, বিদায় বন্ধুগণ! সত্য সন্ধান কোরো, সত্য রক্ষা কোরো, সত্য-সেবক যে তাকে বিশ্বাস করো, সাহায্য করো, সত্যব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করে দাও··· কিসের জন্য দুঃখ করছো তোমরা? এ জীবন তোমাদের কি দিয়েছে? কেন তোমরা মরতে বসেছো···অনাহারে? মুক্তির জন্য বুক বেঁধে দাঁড়াও।···মুক্তি তোমাদের মুখে অন্ন দেবে। সত্যের উদ্বোধন করো···

বলতে বলতে গাড়ি চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাইবিনের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হ'য়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

—এগারো—

মা সরাইয়ে ফিরে এলেন। ক্ষুধা নেই, খাবার পড়ে রইলো প্লেটে। কেবল চোখের ওপর নাচতে লাগলো রাইবিনের সেই নির্যাতন।

পরিচারিকাটি এসে বললো বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে, উঃ পুলিস সাহেব কী মারটা মারলে! আমি কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সব-কটা দাঁত ভেঙে গেছে···থুথু ফেললো, পড়লো ভাঙা দাঁত আর রক্তের চাপ। চোখ এতো ফুলে উঠেছে যে, তা দেখা যায় না। ওরা বললো, দলে আরো লোক ছিল···এ ছিল নেতা···তিনজনকে ধরেছিল···একজন পালিয়েছে ···এরা নাকি ঈশ্বর মানে না। লোকজনকে বলে, গির্জা লুঠ করো···এমনি লোক এরা। অনেকে চোখের জল ফেললো ওদের জন্যে···আবার কোন কোন হতভাগা বলে কিনা, বেশ হয়েছে, বাছাধনেরা একেবারে ঠাণ্ডা! কী নীচ অন্তকরণ দেখেছেন ?—

মা বুঝলেন, টাউন-হলের ভিতর নিয়ে গিয়ে রাইবিনকে আরো এক-চোট মারা হয়েছে। চুপ ক'রে রইলেন তিনি। দরদী শ্রোতা পেয়ে মেয়েটি বলতে লাগলো, বাবা বলেন,···অজন্মার দরুণ এসব হয়!··· পরপর এই দু'বছর অজন্মা। লোকজন হয়রান্ হয়ে গেলো।···তাই এসব হাঙ্গামা।···এই তো সেদিন ভসিনকভের যথাসর্বস্ব বিকিয়ে গেলো দেনার দায়ে। মরিয়া হ'য়ে শেষে বেচারা বেলিফের মুখে লাগালো এক ঘুষি, বললো, এই নাও তোমার পাওনা।···

নীল-চোখ চাষীটি এসে হাজির হ'লো। মা তার সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলে বুঝেছেন, সেও তাঁদের দলের লোক; কাজেই তার ওখানে

রাত্রিবাস করা স্থির করেন। চাষীটি মেয়েটিকে বললো ··ওকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেয়ো। তারপর মার ব্যাগটা তুলে নিয়ে মুচকি হেসে বললো, একদম খালি যে···এটা আমি নিয়ে গিয়ে সাবধান ক'রে রাখছি। আপনি ওর সঙ্গে আসুন,···বলে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলো।

খানিক বাদে মাও মেয়েটির সঙ্গে চাষীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। ছোট্ট একখানি ঘর, কিন্তু পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। এক কোনে টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জলছে। মাকে অভ্যর্থনা ক'রে চাষী বউকে বললো, তেতিয়ানা, যাও, শীগগির পিওরকে ডেকে আন।

তেতিয়ানা চ'লে যেতে মা জিগ্যেস করলেন, আমার ব্যাগ?

নিরাপদ জায়গায় আছে।···মেয়েটি সামনে ছিল ব'লে খালি বলেছিলুম···নইলে ও তো দেখছি বেজায় ভারি।

তাতে কি হল?

তারপর উঠে মার কাছে গিয়ে চাষীটি ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো, সেই লোকটাকে চেনেন আপনি?

মা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ।

তা-ই আন্দাজ করেছিলুম। তাকেও জিগ্যেস করতে বললো, আরো অনেক আছে আমাদের দলে। বেশ লোক রাইবিন···আচ্ছা আপনার ও ব্যাগে তো বই আর কাগজ আছে, না?

হাঁ, ওদের জন্যই নিয়ে এসেছিলুম।

আমাদের হাতেই বই-কাগজ পড়েছিল···আমরাও ওই চাই।···খাঁটি কথা লিখেছে···আমি নিজে বড় একটা পড়তে পারিনে—আমার এক বন্ধু পারে। তাছাড়া আমার বউও প'ড়ে শোনায়।···তা, বই-কাগজগুলোর ব্যবস্থা কি করবেন?

তোমাদের দিয়ে যাবো।

চাষী শুধু বললো, আমাদের! কিন্তু কোনো রকম আশ্চর্যের ভাব দেখালো না!

রাইবিনের কথা ভেবে মার চোখ বারে-বারেই অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠছে। কিন্তু কণ্ঠ তার অকম্পিত, বলেন, মানুষের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তার কণ্ঠরোধ ক'রে তাকে পায়ে মাড়িয়ে যায় ঐ ডাকাতের দল! প্রতিবাদ করলে জবাব মেলে প্রহার এবং নির্যাতন।

চাষী বললো, শক্তি...শক্তি ওদের বেশি কিনা!

মা উত্তেজিত স্বরে বললেন, কিন্তু সে শক্তি রা পেলে কোত্থেকে? ...এই আমাদেরই কাছ থেকে। যা-কিছু তাদের, সব আমাদের কাছ থেকেই পাওয়া।

চাষী বললো, সে কথা ঠিক।... একটা চাকার মতো আর কি।... আমরা চালাই অথচ আমরাই তাতে কাটা পড়ি।...ঐ আসছে।

কে?

আমাদের দলেরই লোক। ওর কাছেই ব্যাগটা রেখেছি।

বউ একটি চাষীকে নিয়ে এলো। এই পিওর। পিওরকে বসতে দিয়ে বউ মাকে লক্ষ্য ক'রে স্বামীকে জিগ্যেস করলো, উনি খাবেন না, স্টিপান?

মা বললেন, না, মা।

পিওর একটু বেশি কথা বলে। মার সঙ্গে মিনিটখানেকের মধ্যেই সে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলো। রাইবিনের কথা উঠতে প্রশ্ন করলো, সে কি আপনার আত্মীয় কেউ?

আত্মীয় নয়...বহুদিনের পরিচিত...দাদার মতো ভক্তি করি।

অর্থাৎ বন্ধু। চরিত্রবান্ লোক বটে! আর নিজের কদর বোঝে… একটা লোকের মতো লোক, বুঝলে, তেতিয়ানা!

তেতিয়ানা জিগ্যেস করলো, বিয়ে করেছে?

মৃত-দার।

তাই এতো সাহস। বিবাহিতেরা এতো সাহস দেখাতে পারে না।

পিওর বললো, কেন,—আমি?…

তেতিয়ানা ঠোঁট উলটে বললো, তুমি? কাজ তো করছো ভারি? খালি বকর-বকর আর ঘরের কোনে বসে এক-আধখানা বই পড়ে ফিস্-ফাস।

পিওর আহত হ'য়ে প্রতিবাদ করলো, কেন, মেলা লোক তো শোনে আমার কথা। এটা বলা তোমার উচিত হলনা, বৌদি।

তেতিয়ানা সে কথা কানে না তুলে বললো, তা ছাড়া, চাষীরা আবার বিয়ে করে কেন? চাকরের একজন চাকরানীর দরকার—তাই! কাজ কি তার?

স্টিপান বললো, সে কি বউ, কাজের কি কোনো কমতি আছে তোমার?

ছাই কাজ। এ কাজ করে লাভ?…ছেলে-মেয়ে বিয়ানো, অথচ তাদের যত্ন করার ফুরসুৎ নেই…খাওয়ানোর কড়ি নেই। খালি খেটে মর। আমারও, মা, দুটি ছেলে ছিল…একটি দু'বছর বয়সে ফুটন্ত জলে পড়ে মারা যায়। আর একটি মারা পড়ে, এই পোড়া খাটুনির ফলেই। আমি বলি, চাষীরা যেন বিয়ে না করে, হাত না বাঁধে। তাহ'লেই তারা সত্যের জন্য খোলাখুলি লড়াই চালাতে পারবে। তাই নয়, মা?

হাঁ।

তারপর মা আবেগের সঙ্গে বিপ্লব কাহিনী, নামজাদা বিপ্লবীদের জীবনী এবং কার্য-প্রণালী ও দেশ-বিদেশের মজুর-প্রগতির কথা চাষীদের কাছে বর্ণনা ক'রে গেলেন।

তেতিয়ানা বললো, তাইতো আমি ওকথা বলি, মা। তারা আর আমরা! আমরা তো জীবন কাটাই ভেড়ার মতো। এইতো ধরুন, আমি লিখতে পড়তে জানি, বই পড়ি আর ভাবি,...এমনও অনেকদিন হয় যে ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না?...কিন্তু লাভ? না ভাবলে জীবনটা ঠেকে ফাঁকা, আর ভাবলেও জীবনটাকে ফাঁকাই ঠেকে। পৃথিবীর কোন-কিছুর যেন কোন উদ্দেশ্য নেই। এই যে চাষীরা...দিনরাত খেটে মরে এক টুকরো রুটির জন্য...কিন্তু কি পায়? কিছুই না। তাইতো দুঃখ পায়, রেগে ওঠে, মদ খায়, মারামারি করে, তারপর আবার কাজ করে। কাজ.. কাজ...কাজ.. কিন্তু কাজ করে লাভ?...বিন্দুমাত্র না।

স্টিপান হঠাৎ বললো, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আলোটা নিভিয়ে দেওয়া ভাল।

পিওর বললো, হাঁ, সতর্ক থাকবে বৈকি, স্টিপান। কাগজ যখন ছড়িয়ে পড়বে লোকদের মধ্যে তখন......

স্টিপান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে বললো, কিন্তু আমি আমার কথা বলিনি।...আমার মতো মানুষের দামই বা কি! একশো এক আনা।

মা বললেন, ভুল করছো তুমি। বাইরের লোক...তোমায় শোষণ করায় যার স্বার্থ...সে তোমার যে দাম কষবে তা গ্রাহ্য নয়! তোমার দাম কষবে তুমি নিজে।

পিওর বিদায় নিয়ে চ'লে গেলো। তেতিয়ানা মাকে বিছানা পেতে

দিতে দিতে বললো, আজকাল চাই মানুষের মধ্যে এই বিদ্রোহকে উস্‌কে দেওয়া। ভাবে তো সবাই, কিন্তু গোপনে নিজের মনে। তাতে চলবে না। মানুষকে মুক্তকণ্ঠে জোর গলায় বলতে হবে। আর, একজনকে প্রথম এই কাজে ব্রতী হ'য়ে পথ দেখাতে হবে। কতকগুলি অসংবদ্ধ ছাড়া-ছাড়া চিন্তায় চলবে না, একটা কর্তব্য স্থির ক'রে কাজের সূত্রে সেগুলোকে গেঁথে তুলবে হবে।···

বিছানা পাতা হ'লে মা শুয়ে পড়লেন। তেতিয়ানা বললো, আপনিও প্রার্থনা করেন না ?···আমিও মনে করি, ভগবান নেই, মানুষকে বোকা বানাবার জন্য এসবের আমদানি হয়েছিল।

মা বললেন, আমি যীশুতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভগবান ? জানিনে ! তিনি যদি থাকবেনই তা'হলে তাঁর মঙ্গল-শক্তি হ'তে আমরা বঞ্চিত কেন ? কেন তিনি মানুষকে দুটো ভাগে বিচ্ছিন্ন হ'তে দিলেন ? কেমন ক'রে তাঁর রাজ্যে সম্ভব হয়, মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এবং উপহাস, অন্যায় ও পাশব আচরণ ?

আমার সন্তান দু'টির মৃত্যুর জন্য দায়ি কে···মানুষই হ'ক আর ঈশ্বরই হ'ক—আমি তাকে কখনো ক্ষমা করবো না···কখ্‌খনো না।

মা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমার তো ছেলে হবার বয়স যায়নি, মা !

তেতিয়ানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে, বললো, না, মা, ডাক্তার বলেছে, আমার আর ছেলে হবে না।

এই রিক্ত-সন্তান নারীর বুকের ব্যথা বুঝে মা নীরব হ'য়ে রইলেন।

স্বামী-স্ত্রী মাকে শুইয়ে রেখে নিজেরাও শুয়ে পড়লো।

—বারো—

শুয়ে শুয়ে মা স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শুনতে লাগলেন।

তেতিয়ানা বললে, বুড়িরা পর্যন্ত একাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর তুমি !···

স্টিপান বললো, আহা, এসব কাজ এত তাড়া-হুড়োয় হয় না। বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখা চাই।

হাঁ, ভাবতে তো তোমায় আগাগোড়াই দেখছি।

স্টিপান বললো, আহা, তুমি বুঝতে পারছো না। কাজ করতে হ'লে এই রকম ক'রে—প্রথমে যারা অন্যায় সয়েছে, অত্যাচার সয়েছে, তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে দলে ভাগাও। তারপর আমি শহরে যাবো—কাঠ কেটে খরচ চালাবো, আর ওদের খুঁজে নিয়ে ওদের সঙ্গে কাজে যোগ দেবো···খুব সন্তর্পণে চলবে এ ব্যাপার! আর সত্যিই, নিজের দাম নিজে কষবে। ঐতো রাইবিন···পুলিস কমিশনার তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরের সামনে দাঁড় করালেও ও দমবেনা। তারপর নিকিতা···হঠাৎ ওর মন বদ্‌লে গেলো কি করে? এ কি যাদু?—না। মানুষ যদি বন্ধুভাবে মিলে মিশে কিছু করে, সবার কাছে তাতে সহানুভূতি পায়।

তেতিয়ানা ব'লে উঠলো, বন্ধুভাবে! চোখের সামনে একটা লোককে মারবে আর আমরা থাকবো হা করে দাঁড়িয়ে!

স্টিপান বললো, সবুর। তার ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আমরা নিজেরা তাকে মারিনি। কর্তারা তো আমাদের বাধ্য করেই এম্‌নি করে মারতে···প্রাণ যতই কাঁদুক, ঘুষি তোমায় চালাতেই হবে,···হুকুম

না তামিল করো, তোমার মরণ। কর্তাদের নিষেধ—মানুষ হোয়োনা, এ বাদে শেয়াল-কুকুর যা-খুশি হতে পারো। বীর হ'লে তোমার রক্ষা নেই···ভবসাগর পার ক'রে দেবার জন্য তারা উঠে প'ড়ে লাগবে, বুঝলে তেতিয়ানা! চাই আজ অত্যাচারিত জন-সাধারণের ক্রোধ এবং বিদ্রোহ!···

পরদিন মা শহরে চলে এলেন। এসে দেখেন বাসা সার্চ হয়ে গেছে ···সব জিনিস তছনছ। আইভানোভিচ বললো, শাসিয়ে গেছে, মা, আমার কাজ খতম হবে। বাঁচা গেলো, মা! চাষীদের কার কি নেই এ হিসেব ক'রে মাইনে গোনা দস্তুরমতো হারামি।

তারপর মা রাইবিনের শোচনীয় গ্রেপ্তার-কাহিনীর বর্ণনা করলেন। আইভানোভিচ প্রথমটা উত্তেজনায় লাল হ'য়ে উঠলো, তারপর দীপ্ত চোখে কিন্তু সংযতকণ্ঠে বললো, চমৎকার লোক! এমন মহৎ। কিন্তু জেলে থাকা ওর পক্ষে কষ্টকর, ও রকম লোক জেলে গিয়ে সুস্থ থাকে না।···

তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, আর ঐ পুলিস এবং সার্জেণ্ট,—ওরা তো শয়তানের হাতের অস্ত্র···পশুকে যেমন পোষ মানায়, ওদেরও তেমনি ক'রে পোষ মানানো হয়েছে। হাঁ, পশু ওরা···আর পশু যখন কামড়ায়, তখন তাকে করতে হয়,···

উত্তেজনায় আইভানোভিচ পাইচারি করতে করতে রাগ-ভরা কণ্ঠে বলতে লাগলো, কী ভয়ানক! মানুষের ওপর অন্যায় কর্তৃত্বমদে মত্ত হ'য়ে মুষ্টিমেয় পশু মানুষকে মারছে, অত্যাচার করছে, গলা টিপে খুন করছে। বর্বরতার সুর উঁচু হতে উঁচুতে উঠছে, নিষ্ঠুরতা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জীবনের নীতি। একটা গোটা জাতি আজ অধঃপতিত। একদল করছে

অত্যাচার। একদল এই অত্যাচার নীরবে স'য়ে মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে আর একদল হুংকার করছে—প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ।···

নিষিদ্ধ কাগজ-পত্রের কথা উঠলে মা কেমন ক'রে তা ছড়াবার বন্দোবস্ত ক'রে এসেছেন তা বলেন। আইভানোভিচ আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে 'মা মা' বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, চাষীরাও তাহ'লে ন'ড়ে উঠেছে!

হাঁ! পেভেল-এণ্ড্রি যদি এখন থাকতো!

আইভানোভিচ বললো, তুমি শুনে হয়তো প্রাণে খুব আঘাত পাবে, মা···কিন্তু পেভেল জেল পালাবে না; সে চায় বিচার। তারপর নির্বাসনদণ্ড হ'লে সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসবে।

মা বললেন, তাই করুক তবে। কিসে ভালো হবে, সে-ই বেশি বোঝে।

আইভানোভিচ বললো, রাইবিনের সম্বন্ধে একটা ইস্তাহার বের করা দরকার।···আমি আজই লিখবো। কিন্তু গ্রামে পাঠাবো কি ক'রে?

কেন, আমি নিয়ে যাবো।

না, মা। তোমার আবার যাওয়া ঠিক হ'বে না। এবার বরং নিকোলাই যাক।

আইভানোভিচ ইস্তাহার লিখে দিলো। মা তা লুকিয়ে রাখলেন গায়ের জামার মধ্যে···ফুরসুৎ মতো ছাপাতে দিয়ে আসবেন ব'লে।

—তেরো—

পরদিন ভোরে অপ্রত্যাশিতভাবে ইগ্নাতি এসে হাজির হয়। তাদের দলের পাঁচজন ধরা পড়েছিল। বাকি সব কেউ পালিয়েছে, কেউ পুলিসের সন্দেহে পড়েনি।

পুলিসের সাড়া পেয়েই ইগ্নাতি ঘর থেকে লাফ দিয়ে প'ড়ে ঝোঁপ এবং বনের আড়ালে আত্ম-গোপন ক'রে শহরের দিকে ছুটেছে। সাত দিন পরে সে শহরে এসে পৌছুল। হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেছে, তবু তার মন খুশি। জুতো খুলে সে একটুকরো কাগজ বের ক'রে মার হাতে দিলো—রাইবিন লিখছে মাকে চিঠি···আমাদের আরো বই চাই, আরো ইস্তাহার চাই। সেই মহিলাটিকে আমাদের জন্য লেখা পাঠাতে বলবেন···

রাইবিনের চিঠি প'ড়ে মার চোখে জল এলো···তার গ্রেপ্তারের সেই করুণ কাহিনী ইগ্নাতিকে শোনান তিনি।···

তারপর ইগ্নাতির ফুলো পায়ের দিকে চেয়ে আইভানোভিচকে তিনি বলেন, ওর পায়ে একটু অ্যালকোহল মালিশ করা দরকার।

আইভানোভিচ্ বললো, নিশ্চয়।

সে অ্যালকোহল নিয়ে এলো। মা ইগ্নাতির পা ধু'য়ে অ্যালকোহল মালিশ করে দিলেন।

ভদ্দরলোক আইভানোভিচ যে তার মতো ছোট লোকের ওপর এতোটা দরদ দেখাবে ইগ্নাতি তা কল্পনাও করতে পারেনি। কাজেই সে অতি মাত্রায় মুগ্ধ এবং অবাক হ'ল। আইভানোভিচ আড়ালে গেলে বললো, আশ্চর্য ব্যাপার!

কি আশ্চর্য ব্যাপার?

এই—একদিকে ওরা মুখে ঘুষি চালায়, আর এক দিকে ধোয়ায় পা। মাঝখানে……

মাঝখানে কি ?

আইভানোভিচ হঠাৎ দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললো, মাঝখানে একদল লোক…যারা প্রহারকর্তার হাতে চুমু খায়, আর প্রহৃতের রক্ত শোষণ করে।

ইগ্নাতি সসম্ভ্রমে তার দিকে চেয়ে বললো, তাই ঠিক।

চা খেতে ব'সে সে বললো, আমার কাজ ছিল, কাগজ বিলি করা… হাঁটতে ওস্তাদ ছিলুম কিনা, তাই রাইবিন এই কাজের ভার দিয়েছিল।

আইভানোভিচ জিগ্যেস করলেন, লোকে কি খুব পড়ে ?

হাঁ খুব—যারা পারে। এমন-কি অনেক ধনীও পড়ে, তবে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নয়! আমরা এ ছড়াই জানলেই শ্রীঘর—এ যে তাদের মরণ-ফাঁদ।

মরণ-ফাঁদ কেন ?

তা ছাড়া কি ? চাষীরা এখন আর জমিদারের তোয়াক্কা না রেখে নিজেরাই জমি বিলি-বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছে। ধনীরা কি জমি কামড়ে ব'সে থাকতে পারবে ? চাষীরা রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেবে ধনীদের…মুনিবও থাকবে না, মজুরও থাকবেনা দুনিয়ায়। এ হাঙ্গামাকে কে ডেকে আনে, বলো ?

রাইবিনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ইস্তাহার-বিলির কথায় ইগ্নাতি সাগ্রহে ব'লে উঠল, আমায় দিন, আমি যাচ্ছি। বনের মধ্যে একটা জায়গায় রেখে সবাইকে বলবো, যাও, ঐখানে গিয়ে নিয়ে এসো। আমিও ধরা পড়বো না, কাজও ফতে হ'বে।

আইভানোভিচ বললো, না বন্ধু, তুমি না! যাবো আমি, তুমি শুধু আমাকে সব খবরাখবর বাৎলে দেবে।

ইগ্নাতি তাতেই রাজি হ'ল। ফন্দি-ফিকির বাৎলে দিতে দিতে বললো, জানলায় চারটে ঘা দেবে। পয়লা তিনটে···তারপর একটু থেমে আর একটা। একজন লাল-চুল চাষী দোর খুলে দিলে তুমি বলবে, ধাই কোথায়, ওদের কাছ থেকে এসেছি···বাস, এইটুকুই বলবে! তা'হলেই বুঝবে সব।

আইভানোভিচ চ'লে গেলো।

—চৌদ্দ—

ফেরারী নিকোলাইর পক্ষে চোরের মতন লুকিয়ে-লুকিয়ে বেড়ানো আর নিষ্কর্মা-জীবন যাপন করা হয়েছিল অসহ্য। কাজেই রাইবিনকে জেল থেকে মুক্ত করার বন্দোবস্তে সেই হ'ল প্রধান উৎসাহী।

পরিচালনার ভার নিলে শশেংকা, আর তাদের সঙ্গে যোগ দিলো গডুন···গডুনের স্বার্থ, তার ভাইপোও এই সঙ্গে মুক্ত হ'বে। মাও সঙ্গে গেলেন নেহাৎ যেচে···প্রাণের টানে। জেলের সেদিকটা গোরস্থান, নির্জন, অনেকটা ফাঁকা। সেদিকে চললেন মা। পথে ছু'জন সৈনিকের সঙ্গে দেখা—মা অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বললেন, হাঁগা, আমার ছাগল ছু'টি হেথা কোন্‌দিকে গেল, দেখেছো?

না।

সৈন্যরা চ'লে গেলে মা নির্ধারিত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালেন। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হ'ল। মা কেঁপে উঠলেন। ঐ আসছে। জেলের দেয়ালের গা ঘিঁসে একটি ল্যাম্পপোস্ট।

একটি লোক বাতিওয়ালার মতো পা ফেলে ফেলে ল্যাম্পপোস্টের কাছে এলো। তার কাঁধে একটা দড়ির সিঁড়ি। বেশি ব্যস্ততা না দেখিয়ে সে সিঁড়িটা দেয়ালে আটকে অতি সহজভাবে বেয়ে ওপরে উঠে দাঁড়ালো, হাত দুলিয়ে ইঙ্গিত করলো, তারপর তর তর ক'রে নেবে এসে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভেতর থেকে দেয়াল টপকে বাইরে নেবে এলো রাইবিন এবং গড়ুনের ভাইপো। তাদেরও অদৃশ্য হ'তে বেশি দেরি হ'ল না।

পরক্ষণেই জেলের পাগলা-ঘণ্টা বেজে উঠলো…পুলিস ছুটছে, সৈন্য ছুটছে…মহা হুলস্থূল।

একটা পুলিস ছুটতে ছুটতে মাকে এসে প্রশ্ন করলো, এই বুড়ি… একটা লোক…কালো দাড়ি তার…তাকে এখান দিয়ে পালাতে দেখেছিস?

হাঁ, বাবা। উই দিকে গেলো…ব'লে মা উল্টো দিক দেখিয়ে দিলেন। সে মহোৎসাহে সেদিকে চ'লে গেলো।

মাও বাড়ি চ'লে এলেন।

হপ্তাখানেক পরে আদালত লোকে লোকারণ্য। আজ মামলা শুরু। আসামীদের আত্মীয়েরা ভিড় ক'রে এসে বসেছে। মা বসেছেন কম্পান্বিত হৃদয়ে, শিজভের পাশে। বিচার-মঞ্চের পেছনের দুয়ার খুলে বিচারকেরা এলেন। সবাই উঠে দাঁড়ালো। তারপরই এলো অন্য এক দুয়ার দিয়ে রক্ষী-সমেত পেভেল, এণ্ড্রি, মেজিন, গুসেভ-রা বাপ-ছেলে, শ্যাময়লভ, বুকিন, শোমোভ এবং আরো পাঁচজন যুবক…মা তাদের নাম জানেন না।

—পনেরো—

মামলা শুরু হলো···বিচারকদের একজন একটা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। উকিলেরা যেন তা শোনার তেমন দরকার বোধ না ক'রে আসামীদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

হঠাৎ পেভেলের তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সবাই চমকিত হ'য়ে নির্বাক হ'য়ে গেলো—এখানে কোন আসামী বা জজ নেই···এখানে আছে শুধু বন্দী এবং বিজেতা।···

জজ যেন উদাসভাবে বললেন, তারপর, এণ্ড্রি নখোদ্‌কা, তুমি কি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ?

এণ্ড্রি সটান দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিয়ে চোখের কোণ দিয়ে চেয়ে বললো, আমার অপরাধ? কি করেছি আমি? চুরিও করিনি, খুনও করিনি! আমি শুধু বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি তেম্‌নি জীবন-যাত্রার, যাতে মানুষ বাধ্য হয় পরস্পর হানাহানি এবং রাহাজানি করতে।

জজ বললেন, সংক্ষেপে জবাব দাও, 'হাঁ' কি 'না'?

এণ্ড্রিও সমান স্পর্ধার সঙ্গে কি একটা জবাব দিলো। শ্রোতৃমণ্ডলী তাতে বেশ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। আসামীদের দিকে সবারই প্রশংসমান দৃষ্টি।

ফেদিয়া মেজিন, তুমি জবাব দাও।

মেজিন একলাফে উঠে দাঁড়ালো···জবাব আমি দেবোনা, দিতে চাইনে। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আমি অস্বীকৃত।···কোন-কিছু বলার ইচ্ছে নেই আমার। তোমাদের আদালতকে আইনসঙ্গত ব'লে আমি

মনে করিনে। কে তোমরা? তোমাদের কি এক্তার আছে আমাদের বিচার কন্বার? সে অধিকার কে দিয়েছে তোমাদের? জন-সাধারণ? না। আমি তোমাদের চিনিনে।...ব'সে সে টপ ক'রে ব'সে পড়লো।

এরপর অভিনয়ের অন্যান্য দৃশ্যগুলি পর-পর অভিনীত হ'তে লাগলো। জজদের মন্তব্য, সরকারি উকিলের আলোচনা, শেখানো-পড়ানো সাক্ষীদের সাক্ষ্য!...কিছুকালের জন্য আদালত ভঙ্গ...তারপর সেসন আরম্ভ।

শুরুতেই সরকারি উকিলের চার্জ-সীট দাখিল। অভিযুক্ত আসামীরা সদাহাস্য, নির্বিকার, তেজস্বী। জজরা যেন অসীম ঔদাসীন্য এবং নির্বিকারিতার এক-একটি ডিপো। সরকারি উকিলের লম্বা বক্তৃতা শোনার ধৈর্য যেন তাদের ছিল না।

সরকারি উকিলের পর আসামীপক্ষের উকিলের ডাক পড়লো।

একজন উকিল উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, জীবন্ত শক্তিমান পুরুষ যে, যার অনুভূতি আছে, সাধুতা আছে, সে কখনও যথাশক্তি বিদ্রোহ না ক'রে পারে না, এই প্রাণহীন, প্রবঞ্চনাময়, মিথ্যাভরা জীবনের বিরুদ্ধে, সে কখনও না দেখে পারে না এই জলন্ত বৈষম্য...

সাবধান হ'য়ে কথা বলুন।

উকিল বিন্দুমাত্র না দমে সমানভাবে বক্তৃতা চালাতে লাগলেন। ফলে সরকারি উকিল বেশ একটু গরম হ'য়ে উঠলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মেতে উঠলো আসামীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন শ্রোতৃদল।

হঠাৎ সব চুপচাপ। পেভেল উঠে দাঁড়িয়েছে। মা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

পেভেল বলতে লাগলো, দলের লোক হিসেবে আমি মানি একমাত্র

আমাদের দলের আদালতবে। এই আদালতে তাই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করবো না। আমি শুধু আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করবো, যা আপনারা বোঝেন না। সরকারি উকিল বলেন, সাম্যবাদের পতাকাতলে আমাদের এ জাগরণ নাকি কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমরা নাকি জার-দ্রোহী ছাড়া কিছুই নই। আমি আজ আপনাদের কাছে বলতে চাই যে আমাদের দেশের বন্ধন-শৃঙ্খল একমাত্র জার নয়···তবে সর্বপ্রথম এবং সর্বঘনিষ্ট বন্ধন হিসাবে তাকে আমরা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য। আমরা সাম্যবাদী··· অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যার ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্য, হানাহানি, স্বার্থের সংঘাত···এবং এই স্বার্থ-সংঘাত মিথ্যা দিয়ে ঢাকার অথবা সমর্থন করার চেষ্টা···অসত্য, শঠতা, ঈর্ষা-দুষ্ট সমাজের আবির্ভাব···আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু। যে-সমাজ মানুষের দাম কষে শুধু ধনোৎ-পাদনের যন্ত্র হিসাবে, সে-সমাজকে আমরা বলি অমানুষিক, সে সমাজ আমাদেব বিরোধী, এর নীতির সঙ্গে আমরা বনিবনাও ক'রে চলতে পারিনে, এর দু'মুখো মিথ্যাবহুল হৃদয়হীনতা, মানুষের ওপর এর নিষ্ঠুর সম্পর্ক আমাদের কাছে অসহ্য। আমরা যুদ্ধ ক'রতে চাই···যুদ্ধ করব···এ সমাজের প্রত্যেক কায়িক এবং নৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে : স্বার্থান্বেষীদের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমরা মজুর···দুনিয়ার সমস্ত-কিছু সৃষ্টির মূলে আমাদের শ্রম···বিরাট যন্ত্র থেকে শুরু করে শিশুর হাতের খেলনাটি পর্যন্ত আমাদেরই তৈরি। সেই আমরা মনুষ্যোচিত মর্যাদা-রক্ষাকল্পে যুদ্ধ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। সবাই আমাদের খাটিয়ে নিতে চায়, খাটিয়ে নিতে পারে—স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র-হিসাবে। আজ আমরা চাই সেই সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তিকে জয় করবার মতো স্বাধীনতা। আমাদের মন্ত্র সহজ। মানুষের জন্য সমস্ত শক্তি, মানুষের জন্য সমস্ত

উৎপাদন-যন্ত্র, সমস্তের ওপর বাধ্যতা-মূলক কাজ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান।...আপনারা দেখতে পাচ্চেন, আমরা আইনদ্রোহী নই।

একজন জজ ব'ললেন, কাজের কথা বল।

পেভেল স্পষ্টস্বরে বলতে লাগলো: আমরা বিদ্রোহী। ততদিন বিদ্রোহী থাকবো, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে,...যতদিন কেউ শুধু হুকুম চালায়, কেউ কেবল তার হুকুমে খাটে। যে-সমাজের স্বার্থরক্ষাকল্পে আপনারা নিযুক্ত, আমরা তার মরণ-শত্রু। আমরা জয়ী না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে কোন আপোস আমাদের হ'তে পারে না। আমরা...মজুররা জয়ী হবোই। সমাজ নিজেকে যতখানি শক্তিমান মনে করে, আদৌ সে ততখানি শক্তিমান নয়। যে সম্পত্তি সৃষ্টি এবং রক্ষাকল্পে লক্ষ লক্ষ লোক আজ দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ, যে বলপ্রভাবে সমাজ আজ মানুষের ওপর এতো শক্তিসম্পন্ন, তা-ই শ্রেণীতে শ্রেণীতে আজ জাগিয়ে তুলেছে এতো সংঘাত, ব'য়ে আনছে মানুষের কায়িক এবং নৈতিক মৃত্যু। দুনিয়ায় আজ যে এতো শক্তির অপব্যবহার তা শুধু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার দুরূহ চেষ্টার দরুণ। বাস্তবপক্ষে আমাদের চাইতে বড় গোলাম আপনারা —আমাদের বদ্ধ দেহ, আর আপনাদের বদ্ধ মন। সংস্কার এবং অভ্যাসের যে জগদ্দল পাথরের তলে প'ড়ে মন আপনাদের পিষ্ট, তা থেকে মুক্ত হবার সাধ্য আপনাদের নেই; কিন্তু মনকে মুক্ত করার পক্ষে কোনো বাধাই নেই আমাদের। আপনারা বিষ ঢেলেছেন আমাদের বাইরে, কিন্তু আমাদের মনে চলেছে তার চেয়েও প্রবলতর এক প্রতিক্রিয়া...তাই-ই আজ ক্রম-বর্ধমান অগ্নিশিখায় জ্ব'লে উঠেছে আমাদের মধ্যে; শুধু তাই নয়, আপনাদের শক্তিও নিচ্ছে শুষে। তার ফলে, মানুষ আদর্শের জন্য যেমনভাবে লড়াই করে, আপনাদের ক্ষমতার জন্য তা আপনারা

পারছেন না। ন্যায়দণ্ড থেকে আত্মরক্ষার যত রকম যুক্তি হ'তে পারে, সব আপনাদের এরি মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। ভাবের জগতে নতুন কোন-কিছু আর সৃষ্টি করতে পারেন না আপনারা, ভাব-জগতে আপনারা দেউলে। নব-ভাবের ভাবুক আমরা, উত্তরোত্তর দীপ্ত হ'য়ে উঠছে আমাদের মন, আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে মুক্তি-সংগ্রামে! সুমহান্ পবিত্র ব্রতের কথা স্মরণ ক'রে দুনিয়ার সকল মজুর আজ এক-প্রাণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতা ছাড়া আপনাদের আর কিছু নেই, যা এই নব-জাগ্রত জীবনের পথে তুলে ধরতে পারেন বাধার মতো। কিন্তু আমরা জানি, যে-হাত দিয়ে আজ আপনারা আমাদের কণ্ঠরোধ করতে যাচ্ছেন, তাই-ই কাল এসে মিলবে আমাদের হাতে বন্ধুর মতো। আপনাদের শক্তি স্বর্ণশক্তি, একান্তই প্রাণহীন·· আপনাদের তা শুধু বিভক্ত করছে পরস্পর-বিধ্বংসী দলে। আর আমাদের শক্তি জীবন্ত-শক্তি—মজুরদের ক্রমবর্ধমান আত্মসংবিতের ওপর তার প্রতিষ্ঠা। আপনারা যা করেন সবই অন্যায়; কারণ সবেরই উদ্দেশ্য মানুষের চার পাশে দাসত্বের বেড়াজাল সৃষ্টি করা। আমাদের কাজ পৃথিবীকে মুক্ত করবে আপনাদের লোভ এবং বিদ্বেষ-প্রসূত ভ্রান্তি ও বিভীষিকা হ'তে। মানুষকে আপনারা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছেন তার জীবন থেকে, তাকে আপনারা করেছেন শতধা-বিভক্ত। সাম্যবাদ এই বিচ্ছিন্ন জগতকে এক ক'রে জুড়ে এক বিরাট শ্রেণীহীন-সমাজের সৃষ্টি করবে। এ হবে, হবে।···

পেভেল থামলো। জজরা দস্তুরমতো উষ্ণ হ'য়ে উঠলেন। পেভেলের সঙ্গে বেশ কড়া ভাষায় এবং চড়া সুরে একজন জজ কথা বলায় পেভেল শান্ত কিন্তু শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো: আমার বক্তব্য

শেষ হয়ে এসেছে। আপনাদের ব্যক্তিগত অপমান করা আমার ইচ্ছা ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, এই যে রঙ্গাভিনয়···যার নাম আপনারা দিয়েছেন বিচার, তার অনিচ্ছুক দর্শক হিসাবে আপনাদের অবস্থা দেখে আমার কষ্টই হয়! শত হ'লেও আপনারা মানুষ···আর মানুষ, তা হ'ক না সে আমাদের শত্রু, তাকে পশুবলের কাছে এমন নির্লজ্জ, হীন, আত্মমর্যাদাবোধশূন্য দেখতে প্রাণে লাগে।···

জজের দিকে দৃকপাত না ক'রে সে বসে পড়লো।

এণ্ড্রি এবং অন্যান্য সঙ্গীরা পেভেলকে আনন্দে অভিনন্দিত করলো।

—ষোলো—

এরপরই উঠে দাঁড়ালো এণ্ড্রি। জজের দিকে চেয়ে বললো, আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী ভদ্রলোকগণ···

জনৈক জজ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, তোমার সামনে আদালত, আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী ভদ্রলোকগণ নয়।

এণ্ড্রি মাথা দুলিয়ে বললো, তাই নাকি? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। আমি দেখছি, আপনারা বিচারক নন, বিবাদী মাত্র।

বাজে না ব'কে মামলার কথা বল!

মামলার কথা? বহুৎ আচ্ছা। আমি জোর ক'রে মনে ক'রে নিলুম যে আপনারা সত্যি-সত্যি জজ, সাধু স্বাধীনচেতা পুরুষ...

আদালত তোমার এসব সার্টিফিকেট চায় না।

এসব চায় না? আচ্ছা, আমি বলে যাচ্ছি। আপনারা হচ্ছেন স্বাধীন মানুষ—আত্ম-পর ভেদ নেই। এখন, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছে

দু'পক্ষ : একদল নালিশ জানাচ্ছে, ও আমার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে, আমার সর্বনাশ করেছে। আর একদল জবাব দিচ্ছে, আমার লুণ্ঠন করার এবং সর্বনাশ করার অধিকার আছে ; কারণ আমি সশস্ত্র···

দয়া ক'রে গালগল্প রাখো।

সে কি ! আমি তো শুনেছি বুড়োরা গালগল্পের বড্ডো ভক্ত।

তোমার মুখ বন্ধ ক'রে দোব। মামলার কথা বলো···রসরঙ্গ না ক'রে।

মামলার কথা ! কিন্তু বেশি কি আর বলবো। যা বলবার তা তো আমার কমরেডরাই বলেছে। বাকি যা তা বলবারও দিন আসছে। তা বলা হবে···দিন আসছে যখন···

আমি তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করছি। ভ্যাসিলি শ্যাময়লভ···

শ্যাময়লভ উঠে তার কোঁকড়া চুল নেড়ে বললো, সরকারি উকিল আমাদের সঙ্গীদের বলেছেন, অসভ্য, সভ্যতার শত্রু···আমি জিগ্যেস করি, আপনাদের এই সভ্যতা চিজটা কেমন ?

তোমার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি আমরা। কাজের কথা বল।

শ্যাময়লভ সে কথা কানে না তুলে বলতে লাগলো, আপনারা গোয়েন্দা পোষেন, মা-বোনদের পথ-ভ্রষ্ট করেন। মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলেন যে, সে চুরি করতে, খুন করতে বাধ্য হয়। তাকে আপনারা নষ্ট করেন মদ দিয়ে···আন্তর্জাতিক হত্যা-ব্যবসায় দিয়ে, বিশ্বব্যাপী মিথ্যা, হীনতা এবং বর্বরতা দিয়ে···এই তো আপনাদের সভ্যতা···। হাঁ, আমরা শত্রু···এ-সভ্যতার শত্রু।···

জজ উচ্চকণ্ঠে তাকে নিষেধ করলো, কিন্তু শ্যাময়লভ যেন আরো

জ্ব'লে উঠলো···কিন্তু আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি আর একটা সভ্যতাকে, যার স্রষ্টাদের আপনারা নির্যাতিত করেছেন, জেলে পচিয়ে মেরেছেন, পাগল ক'রে দিয়েছেন,···

জজ তাকে বসিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বিচার সাঙ্গ হ'লো। দণ্ড হলো—সাইবেরিয়ায় নির্বাসন সকলের। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আসামীরা রক্ষীদের সঙ্গে আদালত হ'তে বেরিয়ে গেলো।

মা'ও ধীরে ধীরে আদালতের বাইরে এলেন। তখন রাত হ'য়ে গেছে। দলে দলে নরনারী এসে তাকে অভিনন্দিত করলো। শশেংকা এসে পেভেলের কথা জিগ্যেস করলো। মা সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন ধীরে, স্থিরভাবে। তিনি ভাবছিলেন, পেভেল, গেলো এইবার আমার পালা। আমারও এমনি বিচার হ'বে, নির্বাসন হ'বে। আমি তখন শুধু একটি আবেদন করবো, সে হচ্ছে পেভেল যেখানে থাকবে, আমায় যেন সেইখানে নির্বাসিত করে।

—সতেরো—

বাড়িতে এসে মা এবং শশা দু'জনে বসে বুনছে ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল। পেভেলের শশার বিয়ে হ'বে···ছেলে হ'বে···মা নাতিকে আদর করবেন ···পেভেল বাঁধা পড়তে চাইবে না···কাজের তাগিদে দূরে চ'লে যেতে চাইবে···শশা বাধা দেবে না···সে হবে যোগ্যা সঙ্গিনী···স্বামীর সহায়··· বাধা নয়···এমনি আরো কত-কি!

হঠাৎ আইভানোভিচ এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, তোমরা এখান থেকে পালাও···নইলে ধরা পড়বে। গোয়েন্দা যেমন ভাবে আমার পিছু নিয়েছে তাতে খুব সম্ভব আমি শীগ্গিরই গ্রেপ্তার হবো। এই পেভেলের বক্তৃতা···ছাপানো দরকার···নিয়ে লুকিয়ে রাখো···আই-ভানকে দিয়ো···ব'লে একখানা কাগজ মার হাতে দিলো।

মা বললেন, আমায় ধরবে?

নিশ্চয় এবং তাতে অনেক কাজের ব্যাঘাত হ'বে। তুমি বরং লিউদ্-মিলার কাছে যাও।···কাল ভোরে একটা ছেলে পাঠিয়ে খবর নিয়ো, আমি আছি কি নেই।

মা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। শশা অনেক দূর তাঁর সঙ্গে গেলো, বললো, চমৎকার এই আইভানোভিচ। মরণ যখন ডাক দেবে, তখনো ও চলবে এমনি সহজ শান্তভাবে। চশমাটা ঠিক করতে করতে শুধু বলবে, তোফা, তারপর মরবে।

মা, বললেন, আমি ওকে বড় ভালোবাসি।

শশা বললো, আমি অবাক হই। ভালোবাসা? না,—আমি ওকে

শ্রদ্ধা করি। কাটখোট্টা সাদা-সিধে বাইরের অভ্যন্তরে একখানি কোমল অন্তঃকরণ···

তারপর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলে উঠলো, মনে হচ্ছে কেউ পিছু নিয়েছে। যাই, মা···গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে বুঝলে লিউদ্‌মিলার ঘরে ঢুকো না।···

শশা চ'লে গেলো।

মা লিউদ্‌মিলার কাছে এসে কাগজটা তার হাতে দিলেন। তারপর আইভানোভিচের কাহিনী বললেন খুলে···কেমন ক'রে সে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

লিউদ্‌মিলার চোখে-মুখে এসে পড়েছে অগ্নির রক্তিমাভা। স্থির কণ্ঠে সে বললো, কিন্তু আমার কাছে যখন তারা আসবে, আমি গুলি করবো। ধরা দোবনা। অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার অধিকার আমার আছে। অন্যকে যখন যুদ্ধে উত্তেজিত করছি, তখন আমিও যুদ্ধ করবো। শান্তির অর্থ আমি বুঝিনে···শান্তি আমি চাইনে।

মা ধীরে ধীরে বলেন, তোমার কাছে জীবন তাহলে সুখপ্রদ হবেনা, মা।

লিউদ্‌মিলা সে কথাব জবাব না দিয়ে পেভেলের বক্তৃতাটা পড়ে গেলো, বললো, বেশ! আমি এই-ই চাই, কিন্তু এতেও দেখছি শান্তির কথা আছে। এ যেন গোরস্থানে ডঙ্কা-নিনাদ—যদিও ডঙ্কাবাদক শক্তিমান।

তারপর পেভেলের কথা তুলে বললো, চমৎকার লোক, মহাপ্রাণ কিন্তু এমন ছেলে পাওয়া যেমনই গৌরবের তেমনি ভয়ের।

মা বলেন, গৌরবেরই, মা। ভয় আর কিছু নেই।

—আঠারো—

পরদিন জানা গেল, আইভানোভিচ ধরা পড়েছে। ডাক্তার আইভানও এসে পড়লো কিছুকালের মধ্যে। বললো, মা, তুমি এখানে? তোমাকেও খুঁজছিল। আইভানোভিচ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলো। তাতে বিপদ কাটানো যাবেনা, মা। সে যাক। জনকয়েক ছেলে কাল পেভেলের বক্তৃতাটা হেক্‌টোগ্রাফে পাঁচশ কপি ছাপিয়েছে···শহরে ছড়াতে চেয়েছিল। আমি তার বিরুদ্ধে—ছাপানো কপি শহরে ছড়ানো ভালো···এগুলো অন্যত্র পাঠানো যাবে।

মা সোৎসাহে বললেন, আমায় দাও, আমি ন্যাটাশাকে দিয়ে আসছি।

ডাক্তার বললেন, এখন তোমার একাজ করতে যাওয়া ভালো হবে কিনা জানিনে। এখন বারোটা, দুটো পাঁচে গাড়ি। পৌঁছাবে পাঁচটা পনেরোয়—সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছুবে, দেরি তেমন হবে না। কিন্তু কথা তা নয়।

কথাটা কি? কাজটা ভালোভাবে হাঁসিল করা, এই তো! তা আমি পারবো।

লিউদ্‌মিলা বললো, কিন্তু তোমার পক্ষে এ বিপজ্জনক।

কেন?

ডাক্তার বললেন, কারণ হচ্ছে এই—আইভানোভিচ ধরা পড়ার এক ঘণ্টা আগে তুমি উধাও হয়েছো; তারপর মিলে তুমিও গেলে আর ইস্তাহারের আবির্ভাব হলো।···

মা জেদ ক'রে বললেন, না আমি যাবো। ফিরে এলে যখন ধরতে আসবে, তখন একটা-কিছু ব'লে তাদের ফেরাতে পারব।

ডাক্তার বললেন, বেশ তাই হ'ক। স্টেশনে বসে ইস্তাহার পাবে।

ডাক্তার চ'লে যেতে লিউদ্‌মিলা বললেন, চমৎকার তুমি, মা।

আমারও এক ছেলে আছে···তেরো বছর তার বয়স, কিন্তু সে আজ থেকেও নেই। তার বাপ···আমার স্বামী সহকারী সরকারি উকিল। হয়তো এদ্দিনে সরকারী উকিল হ'য়ে গেছেন। ছেলে তার সঙ্গে। ছেলে কেমন হ'বে সময় সময় ভাবি।···যাদের আমি সেরা মানুষ ব'লে মনে করি তাঁদের শত্রু যে, তার হাতে পড়েছে আমার ছেলে। আমার কাছে থাকতে পারছে না! আমি আছি এক ছদ্মনামে। আট বছর তাকে দেখিনা, আট বছর···

ধীরে ধীরে জানালার কাছে যেয়ে বাইরে ম্লান আকাশের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো, সে যদি আমার সঙ্গে থাকতো, কত জোর পেতাম আমি। বুকে সর্বক্ষণ এই ব্যথাটা লেগে থাকতোনা।···এর চেয়ে যদি মরতোও সে, আমার পক্ষে তাও সওয়া বরঞ্চ সহজ হ'তো। জানতাম সে মৃত, কিন্তু শত্রু নয়। মাতৃস্নেহের চাইতেও যা মহৎ, যা প্রিয়তর, যা বেশি দরকার সেই ব্রতের শত্রু নয়।

আহা মা···ব'লে মা লিউদমিলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

লিউদমিলা তেমনি তদ্গতভাবে বললো, হাঁ, তুমি সুখী, মা তুমি সুখী। কী মহান দৃশ্য—মা আর ছেলে একসাথে, পাশাপাশি···এ খুব কম মেলে।

মা যেন নিজের অজ্ঞাতে বলে ফেললেন, হাঁ, মা, এত সুন্দর···অভিনব ···এ যেন এক নবীন জীবন। তোমরা সবাই সত্যপথের যাত্রীদল পাশাপাশি চলেছো···যাদের আগে দেখিনি, তারা হঠাৎ যেন পরম আত্মীয় হ'য়ে গেছো। সব কথা আমি বুঝি না, কিন্তু এটা বুঝি, মা···বুঝি ছেলেরা দুনিয়ার পথ বেয়ে এগোচ্ছে সকলে একটি লক্ষ্যের দিকে···সমস্ত অন্যায়কে পায়ে দলে, সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত ক'রে, সমস্ত তত্ত্বকে আয়ত্ত ক'রে,

সমস্ত মানুষের পক্ষ নিয়ে···তারা এগিয়ে চলেছে। তরুণ তারা, শক্তিমান তারা, তাদের অদম্য শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে, এক উদ্দেশ্য সাধনে, সে হচ্ছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। মানুষের সকল দুঃখকে তারা জয় করতে চলেছে। পৃথিবীর বুক হতে দুঃখকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য তারা অস্ত্রধারণ করছে, যা-কিছু বীভৎস তা দমন করতে বেরিয়েছে তারা,—দমন করবে। একজন বলেছিল আমায়, আমরা এক নতুন সূর্য প্রজ্বালিত করবো—হাঁ, তারা তা করবে। সমস্ত জীবনকে একপ্রাণে গাঁথবে তারা, সমস্ত ছিন্ন হৃদয়কে একত্র সম্মিলিত করবে তারা। জীবনকে শুদ্ধ, পবিত্র, উজ্জ্বল করবে তারা।··

ভাবে তন্ময় হ'য়ে মা আকাশের দিয়ে আঙুল তুলে বললেন, ঐ সেই সূর্য—গৌরবময় স্বর্ণ-সুষমাদীপ্ত মানুষের সুখ-সূর্য। সমস্ত ভুবনকে চির-কালের জন্য উজ্জ্বল ক'রে রাখবে এ···পৃথিবীর সবাই, সমস্তখানি দীপ্ত হ'বে মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমে, বিশ্বের সমস্ত-কিছুর ওপর মানুষের প্রীতিতে।···এই সত্য এবং যুক্তি-পন্থীরা সকলের কাছে ব'য়ে নিয়ে যাবে প্রেমের আলোক। সমগ্র দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলবে তারা এক নতুন আশমানে, সমস্ত-কিছুকে ভাস্বর ক'রে তুলবে তারা অন্তরের অনির্বাণ জ্যোতিতে, নবযাত্রীদের এই বিশ্বপ্রেম হতে উদ্ভুত হবে এক নবজীবন। কে নির্বাণ করবে এ শক্তিকে? কোন্ শক্তি এর চাইতে মহত্তর? কে দমিত করবে এ শক্তিকে? পৃথিবী এর জন্ম দিয়েছে, সমস্ত মানুষ এর জয়-কামনা করেছে! রক্তের নদী···শুধু তা কেন, সমুদ্র বইয়ে দাও, এ নিভবে না।···

লিউদ্‌মিলার হাত ধরে তিনি বললেন, মা, মানুষের কাঙ্ক্ষিত আলোক যে তার নিজের মধ্যেই আছে, একথা জানা যে কতো হিতকর তা তোমায়

কি ক'রে বলবো! এমন দিন আসবে যখন মানুষ এটা বুঝবে, মানুষের প্রাণ সে আলোকে মণ্ডিত হবে। এর অনির্বাণ শিখায় সকলের প্রাণ জ্বলে উঠবে।...পৃথিবীতে আজ জন্ম নিয়েছে এক নব দেবতা...সে দেবতা মানুষ...সমস্তের জন্য সমস্ত-কিছু, সমস্ত-কিছুর জন্য সমস্ত, প্রত্যেকের জন্য ষোলো-আনা জীবন, ষোলো-আনা জীবনের জন্য প্রত্যেকে ...এমনিভাবে আমি তোমাদের সবাইকে বুঝেছি। এই দুনিয়ায় তোমাদের আবির্ভাব এরি জন্য। সত্যি-সত্যিই—তোমরা সবাই কমরেড, আত্মীয়, সাথী, কারণ তোমরা সবাই সত্যের সন্তান...সত্য তোমাদের জনম দিয়েছে—সত্যের দৌলতে তোমরা বেঁচে আছো...যখনই নিজের মনে উচ্চারণ করি, কমরেড, তখনই যেন প্রাণ দিয়ে শুনি,—তোমরা যাত্রা করেছো.. সর্বস্থান হ'তে...দলেদলে...একই কার্যের সঙ্কল্প নিয়ে। কানে যেন ভেসে আসে মত্ত হর্ষধ্বনি। দুনিয়ার সমস্ত মন্দিরের সব ক'টা ঘণ্টা যেন একসঙ্গে বেজে উঠেছে অপূর্ব এক উৎসব-সমারোহে।

লিউদ্‌মিলা আশ্চর্য হয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে বললো, অপূর্ব, এ যেন উচ্চগিরিশিরে সূর্যোদয়।

—উনিশ—

সময় মত মা স্টেশনে গিয়ে হাজির হ'লেন। একটি যুবক ইস্তাহার-ভরা একটা হলদে ব্যাগ দিয়ে গেলো তাঁর কাছে। মা একটা বেঞ্চিতে ব'সে ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

গোয়েন্দারাও নিশ্চিন্ত ছিলোনা। তারা মার চারদিকে এসে জড়ো

হ'ল, এক বুড়ো তাঁর দিকে চাইলো ক্রোধ-বঙ্কিম দৃষ্টিতে। মা তার দিকে চেয়ে সংযতকণ্ঠে বললেন, কি চাও তুমি ?

কিছু না।

একজন ব'লে উঠলো…বুড়ি—চোর কোথাকার।

আমি চোর নই, মা গর্জন করে উঠলেন।

দেখতে দেখতে চারপাশে বেশ একটা ভিড় জমে গেলো।

কি, কি, ব্যাপার কি ?

একটা গোয়েন্দা।

চোর…।

কে, ঐ বুড়ি ?

চোর হলে কখনো চেঁচায় ?

মা জোর গলায় বলেন, আমি চোর নই। কাল ওরা রাজনৈতিক আসামীদের বিচার করেছে। তাদের মধ্যে একজন…পেভেল একটা বক্তৃতা দিয়েছিলো…এই সেই বক্তৃতা…আমি লোকদের কাছে তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে তারা এ পড়ে সত্য চিন্তা করে। এই বলে কাগজ বের ক'রে উঁচুতে দুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিলেন।

একজন ব'লে উঠলো, এতে বখ্‌শিস যা মিলবে তা বিশেষ লোভনীয় নয়।

হাঁ।

মা দেখলেন, সবাই কাগজ হাতাহাতি ক'রে নিয়ে পকেটে, বুকে গুঁজে রাখতে লাগলো। উৎসাহিত হ'য়ে আরো কাগজ ছড়াতে ছড়াতে বললেন, এর জন্য, মানুষের কাছে এই পবিত্র সত্য প্রচার করার জন্য, আমার ছেলে এবং তার কমরেডরা নির্বাসিত হয়েছে।—

বিস্মিত, মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী আরো চেপে দাঁড়ালো মার দিকে। ভিড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। মা বলতে লাগলেন, দারিদ্র্য, অনশন, ব্যাধি··· শ্রম ক'রে গরীবের লাভ হয় এই। সমাজের এই ব্যবস্থা আমাদের ঠেলে দেয় চুরির দিকে, অন্যায়ের দিকে। আর আমাদের মাথার ওপর ব'সে আছে ধনীরা·· শান্তিতে এবং তৃপ্তিতে। যাতে আমরা তাদের বাধ্য থাকি তাই তাদেরই হাতে পুলিস, সরকার সৈন্য-সামন্ত সব-কিছু! সবাই আমাদের বিরুদ্ধে, সব-কিছু আমাদের প্রতিকূলে। আমাদের জীবন আমরা নষ্ট ক'রে চলেছি দিনের পর দিন শ্রমে · নোঙ্‌রামীতে·· প্রবঞ্চনায়। আর ওর মজা লুঠছে, রাজভোগ ওড়াচ্ছে আমাদের শ্রমের সুবিধা নিয়ে। কুকুরের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রেখেছে আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে। আমরা কিছু জানি না, আতঙ্কে আমরা সব-কিছুকেই ভয়ের চোখে দেখি। আমাদের জীবন এক অমাবস্যার অন্ধকার-ঘেরা রাত্রি—এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। মনের বিষে আচ্ছন্ন ক'রে রেখে ওরা আমাদের রক্তপান করছে। ওরা অতিভোজনে ভুঁড়ি বাগাচ্ছে, বমি করছে,—ওরা লোভ-শয়তানের চেলা···তাই নয় কি?

তাই-ই।

মা দেখতে পেলেন, ভিড়ের পিছনে দু'জন পুলিস এবং সেই গোয়েন্দা। অমনি তাড়াতাড়ি কাগজগুলো ছড়াতে গেলেন, কিন্তু কার যেন একখানা অপরিচ্ছন্ন হাত এসে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পলকে অদৃশ্য ক'রে ফেললো—তারপর প্রশ্ন হ'ল, কাকে বলবো? কাকে খবর দেবো?

মা তাতে কান না দিয়ে বলতে লাগলেন···এই জীবনযাত্রাপ্রণালীকে বদলাতে, সকল মানুষকে মুক্তি দিতে, আমার মতো তাদের জীবন্ত কবর হ'তে তুলে নবজীবন দিতে এগিয়ে এসেছে কতিপয় যুবক···যারা তাদের

গোপন প্রাণে পেয়েছে সত্যের দর্শন···গোপনে···কারণ, তোমরা জানো আজ যা সত্য, মানুষ তা খোলাখোলি বলতে পারেনা। ওরা তা'হলে গুলি করবে, টুটি টিপে ধরবে, জিভ কেটে ফেলবে। ধন একটা শক্তি কিন্তু তা সত্যের সুহৃদ নয়। সত্য ধনীর চির-শত্রু, মরণ-শত্রু। আমাদের ছেলেরা দুনিয়ায় এই সত্যের বার্তা প্রচারে বেরিয়েছে। তারা পবিত্র, তারা জ্যোতির্ময়। সংখ্যা তাদের অল্প, শক্তি তাদের কম,·· কিন্তু দলে বাড়ছে তারা। তরুণ প্রাণ সমর্পণ করছে তারা স্বাধীন সত্যের ব্রতে, সত্যকে পরিণত করছে তারা সর্বজয়ী শক্তিতে। তাদের প্রাণের পথ দিয়ে সেই সত্য এসে ঢুকবে আমাদের কঠোর জীবনে!—আমাদের উদ্দীপিত ক'রে তুলবে, সঞ্জীবিত করে তুলবে; আত্ম-বিক্রয়ী যারা, ধনী যারা, তাদের অত্যাচার থেকে টেনে তুলে বাঁচাবে। তোমরা বিশ্বাস কর একথা।

ভাগো এখান থেকে—পুলিসেরা ভিড় ঠেলতে ঠেলতে চেঁচাতে লাগলো।

বেঞ্চির ওপর উঠে নাও।

দরকার নেই—এখনই গ্রেপ্তার হবো।

তাড়াতাড়ি ব'লে যাও। এসে পড়লো ব'লে।

মা বলেন, সেই সত্য-প্রচারকদের, সর্বরিক্ত-দরিদ্রের বান্ধবদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও···আপোস করোনা, বন্ধুগণ, আপোস করোনা। শক্তি-গর্বীদের কাছে মাথা নুয়িয়োনা। ওঠো, জাগো মজুর ভাইসব, এ জীবনের নিয়ন্তা তোমরা, তোমাদের শ্রমের দৌলতে সবাই বেঁচে আছে, অথচ তোমরাই বন্দী। হাত তোমাদের খোলা। শুধু কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। চেয়ে দেখো, তোমাদের চারিদিকে বন্ধন। ওরা তোমাদের খুন করছে, তোমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করছে।···আজ মন-প্রাণ একীভূত

ক'রে একশক্তিতে উঠে দাঁড়াও। সমস্ত বাধা পরাভূত হবে। তোমরা ছাড়া তোমাদের আর বন্ধু কেউ নেই—এই কথাই মজুরদের বন্ধুরা তাদের বলতে চেয়েছে এবং বলতে গিয়ে কারাগারে, নির্বাসনে পলে পলে প্রাণ দিয়েছে। অসৎ লোকেরা কি এমনিভাবে কথা বলে? প্রতারকরা কি এমনিভাবে প্রাণ দেয়?

পুলিসরা 'ভাগো' 'ভাগো' বলে উপর্যুপরি ঠেলতে লাগলো লোক-গুলোকে। মার প্রাণ যেন কথার ভারে, আবেগে উচ্ছ্বাসে ঝংকৃত হ'তে লাগলো গানের মতো? কম্পিত ভগ্নকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ছেলের এই বাণী এক ন্যায়নিষ্ঠ শ্রমিকের বাণী···আত্মবিক্রয় যে করেনি তার বাণী। এর সত্যতা তোমরা বুঝতে পারবে এর স্পষ্ট তেজোদৃপ্ত ভাষা হ'তে, নির্ভীক এ ভাষা। হে আমার মজুর বন্ধুগণ, এই নির্ভীক, নিত্য জ্ঞানদীপ্ত বাণী আজ তোমাদের কাছে উপস্থিত। প্রাণ খুলে একে গ্রহণ কর···এ দিয়ে প্রাণকে পুষ্ট কর। তোমাদের শক্তিলাভ হবে, সব আপদ হ'তে আত্মরক্ষা করার, সত্যের পরিপন্থী যুক্তির প্রতিকূল সবকিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। এ বাণী গ্রহণ কর, বিশ্বাস কর,—একে পাথেয় করে বিশ্বমানবের সুখের পথে যাত্রা কর, পরম আনন্দভরে এক নবজীবনের অভিমুখে অগ্রসর হও!···

মায়ের বুকে এক প্রচণ্ড ঘুষি এসে পড়লো। মা ট'লে বেঞ্চির ওপর পড়ে গেলেন। জনতার ওপরও অবিশ্রাম প্রহার চলতে লাগলো।

মা একটু পরেই শেষ শক্তি প্রয়োগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাইসব, তোমাদেব বিচ্ছিন্ন শক্তি একত্র ক'রে এক মহাশক্তির সৃষ্টি কর···

একজন বৃহদাকার পুলিস তার কলার ধ'রে ধম্‌কে উঠলো, চুপ রও। জনতাকে ভয় দেখিয়ে বলতে লাগলো, ভাগো।

মা বললেন, কোনো-কিছুতেই ভয় পেয়ো না। ওরা কি যন্ত্রণা দেবে? এর চাইতে ঢের-ঢের বেশি যন্ত্রণা জীবন-ভোর সইছো তোমরা।...

চুপ কর বলছি, ব'লে একজন পুলিস তাঁর একহাত ধরলো, তারপর অন্যদিক থেকে আর একজন অন্য হাতটা ধ'রে লম্বা পা ফেলে মাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

মা বলতে লাগলেন, এর চেয়ে ঢের...ঢের বেশি নির্যাতন অহর্নিশ গোপন-কাঁটার মতো তোমাদের অন্তর-বিদ্ধ ক'রে তুল্‌ছে, তোমাদের শক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে।...

গোয়েন্দা গর্জন করে উঠ্‌লো, এই বুড়ি, থাম।

মা বে-পরোয়া হ'য়ে বলতে লাগলেন,—এই নব-উদ্বুদ্ধ আত্মাকে হত্যা করে কার সাধ্য?...

একটা গাল দিয়ে গোয়েন্দাটা মার মুখের ওপর এক চড় লাগালো। একমুহূর্তের জন্য মা চোখে অন্ধকার দেখলেন। রক্তের নোনা স্বাদে তাঁর মুখ ভরে এলো। কানে এলো ক্ষিপ্ত জনতার চীৎকার, খবর্দার, ওঁকে মেরো না।—শয়তান কোথাকার—দোব এক ঘা বসিয়ে—

মা উৎসাহিত হ'য়ে বলতে লাগলেন—রক্তে ওরা মুক্তিকে ডুবিয়ে দিতে পারবে না, সত্যের শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারবে না তারা।

মার মাথায় পিঠে ঘাড়ে ঘা প'ড়তে লাগলো। চারদিকের সব-কিছু যেন ঘুরতে আরম্ভ করলো। চারদিকে চীৎকার, তর্জন-গর্জন, হুম্‌কি—কানে যেন তালা লাগছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, পায়ের তলা

থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। পা নুয়ে পড়ছে, শরীর কাঁপছে, জ্বলছে, টলে পড়ছে কিন্তু চোখ বন্ধ হয়নি। মা দেখলেন, জনতার চোখে এক অপূর্ব উত্তেজনা।

তাঁকে ঠেলে এক দোবের ভিতর দিয়ে ঢোকানো হ'ল। পুলিসের কবল থেকে হাত ছিনিয়ে দরজার কাঠ ধরে মা বলে উঠলেন—রক্তের সমুদ্র বহালেও সত্যকে ডুবিয়ে মারতে পারবে না ওরা।

পুলিসেরা মার হাতের ওপর ঘা লাগালো।

—বোকা ওরা, নিজেদের ওপর জমিয়ে তুলছে বিদ্বেষের স্তূপ। এক দিন তারই তলে চাপা পড়বে ওরা···

কেউ যেন গলা টিপে কণ্ঠরোধ করলো—মার গলা থেকে মোটা স্বরে বেরিয়ে এলো : নির্বোধ হতভাগ্য ওরা, ওদের জন্য দুঃখ হয়···

সমাপ্ত